নূরনবী

এয়াকুব আলী চৌধুরী

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

নূরনবী

এয়াকুব আলী চৌধুরী

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪০১ মার্চ ১৯৯৫

ষষ্ঠ সংস্করণ দশম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0326-8

ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলাদেশে এমন কিছু চৈতন্যজাগর মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁরা সমগ্র বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন উন্নত জীবনবোধ, সমৃদ্ধ চিন্তার জগৎ, স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং ঋদ্ধ মনীষা। কিন্তু রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ—এই সুদীর্ঘ সময়-পরিসরে বাঙালির যে জাগরণের পর্ব চলছিল সেখানে শিল্প এবং চিন্তার জগতে একমাত্র মীর মশাররফ হোসেন ছাড়া কোনো বাঙালি মুসলমান তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হননি। বাঙালি মুসলমানের যাত্রা শুরু মূলত বিশ শতকের প্রথম ভাগে। এয়াকুব আলী চৌধুরী বাঙলার জাগরণের সেই মুসলিম অধ্যায়ের সূচনাপর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য লেখক।

এয়াকুব আলী চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন উনিশ শতকের শেষভাগে। ফলে তাঁর মানসজগৎ ছিল রেনেসাঁ যুগের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। তাঁর চৈতন্যে ছিল আধুনিক জীবনবোধ, বুদ্ধির দীপ্তি, উন্নত মূল্যবোধ, জীবনকে আধ্যাত্মিক নয়, মানবিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। সে যুগের যে নগণ্যসংখ্যক বাঙালি মুসলমানের মধ্যে উপর্যুক্ত গুণাবলি দৃষ্টিগোচর হয় এয়াকুব আলী চৌধুরী তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে বিশিষ্ট।

ইসলাম ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস ; কিন্তু তিনি কখনো মৌলবাদী ছিলেন না। ধর্মের দার্শনিক যুক্তির প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। তাঁর সারাজীবনের সাহিত্যসাধনার মূল বিষয় ছিল ধর্মীয় দর্শনের চর্চা। এয়াকুব আলী চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৬ সালে ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার মাগুরাডাঙ্গা গ্রামে। পাংশা স্কুল থেকে এম-ই পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ভর্তি হন রাজবাড়ি সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর পক্ষে বি এ পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনে সক্ষম না হলেও সুদীর্ঘ সাধনা ও নিবিষ্ট অধ্যবসায়ের ফলে তিনি নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

এয়াকুব আলী চৌধুরী যখন বি এ ক্লাসের ছাত্র তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'কোহিনূর' পত্রিকার সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ছাত্রাবস্থাতেই 'কোহিনূর' সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর ওপর। তখন আর্থিক অনটন, পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব, ক্লাসের লেখাপড়া ইত্যাদির চাপ একযোগে এসে পড়ায় অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষারও ইতি ঘটে যায়।

১৯১৪ সালে চট্টগ্রামের জোরওয়ারগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে এয়াকুব আলী চৌধুরী শিক্ষকতা শুরু করেন। সাহিত্যিক ডা. লুৎফর রহমানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এখানেই। সেই পরিচয় পরবর্তীকালে গভীর বন্ধুত্বে রূপ নেয়। এখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি রাজবাড়ি সূর্যকুমার ইন্সটিটিউশনে চলে আসেন। এরপর পাংশা হাইস্কুলেও শিক্ষকতা করেন কিছুকাল। শিক্ষকতার পাশাপাশি এয়াকুব আলী চৌধুরী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে এবং ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। খেলাফত আন্দোলনের সময় কারারুদ্ধ হন তিনি। কারামুক্তির পর আর আগের চাকরিতে ফিরে যেতে পারেননি। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এরপর চলে আসেন কলকাতায়। সেখানে মেজো ভাই আওলাদ আলী চৌধুরীর সঙ্গে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। এখানে এসে তাঁর যোগাযোগ ঘটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সঙ্গে। কিছুকাল তিনি এই সমিতির সম্পাদকও ছিলেন। এই সমিতির মুখপাত্র হিসেবে ১৩৩৩ সালের পৌষ মাসে তাঁর এবং কবি গোলাম মোস্তফার যৌথ সম্পাদনায় 'সাহিত্যিক' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে এয়াকুব আলী চৌধুরী ছিলেন চিরকুমার। দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণের সার্বিক দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর ওপর। বিষয়সম্পত্তির দৈন্য এবং সীমিত উপার্জনের কারণে তাঁর পক্ষে এই দুই পরিবারের ভার বহন করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তিনি। জীবনের শেষ আট–নয় বৎসর তিনি এই রোগে ভুগেছেন। শেষের চার–পাঁচ বৎসর প্রায় জীবন্মৃত অবস্থায় তাঁর দিন অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যুর দুই বৎসর আগে এ কে ফজলুল হকের সরকার এয়াকুব আলী চৌধুরীর জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৪০ সালের ১৫ ডিসেম্বর নিজের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়।

শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও চিন্তাশীল। পরিবারের মধ্যেই ছিল সাহিত্যিক পরিবেশ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রওশন আলী চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি সাহিত্যচর্চায় প্রেরণা পান। তিনি যখন এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র তখনই 'ধর্মের কাহিনী' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ হয়ে আছে। বিশেষ করে 'মানব মুকুট' ও 'নূরনবী' আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষার সৌন্দর্যে অনন্য। 'শান্তিধারা' গ্রন্থটিতে তিনি ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তিসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অসাধারণ ভাষা–ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। 'মানব মুকুট' গ্রন্থে তিনি হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর জীবনকে অলৌকিকতা–বর্জিত সাধারণ মানবিক গুণাবলির ভিত্তিতে অবলোকন করেছেন।

এয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনাসমূহের আত্মা হচ্ছে চিন্তা; আর সেই আত্মা অবয়ব লাভ করছে শক্তিশালী কবিত্বমণ্ডিত উদ্দীপ্ত গদ্যের মাধ্যমে। একই সঙ্গে তিনি ভাবুক এবং কবি। তাঁর গদ্য যুক্তি এবং আবেগের সম্মিলিত উদ্ভাস। তাঁর গদ্যে আবেগ মূর্ত হয় ধ্বনিঝংকারের মাধ্যমে; গদ্য এগিয়ে চলে দুকূলপ্লাবী জলধারার মতো ক্রমাগত মাধুর্যের প্লাবন সৃষ্টি করে করে।

'নূরনবী' হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর কিশোরপাঠ্য–জীবনী। শিশু–কিশোরদের উপযোগী জীবন–কথা রচনার এই পদ্ধতি বাংলা ভাষায় সম্ভবত এই প্রথম। মহানবীকে রূপকথার রাজপুত্র হিসেবে কল্পনা করে অর্থাৎ শিশু–কিশোরদের মধ্যে ঠিক ঐ রকম মহৎ মানুষ হবার স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়ে এয়াকুব আলী চৌধুরী রচনা করেছেন 'নূরনবী' গ্রন্থটি। 'নূরনবী' যে কোনো শিশু–কিশোরকে অমল স্বপ্নে উদ্বেল করে তোলে। এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতাই এখানে। 'নূরনবী' বইটি রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরমার ঝুলির লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"নূরনবী পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ভাষা সরল ও সুন্দর এবং ইহার বিষয় ও রচনাপ্রণালী শিশু পাঠকদের পক্ষে মনোরম। এইরূপ সহজ বাংলায় লেখা কঠিন কাজ। আপনি তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।"

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার লিখেছিলেন—

"নূরনবী পাঠ করিয়া কি আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা বুঝান সহজ নয়। রূপকথার যে সুর ও ভাষা আপনি ইহাতে লইয়াছেন আজ দেশের ছেলেমেয়েদের বুকে বুকে আপনি সেই গান সত্য মনোরম করিয়া বাজাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাপুরুষের জীবনী এইরূপ করিয়া লিখিতে পারিলে যে কাজ করিতে পারা যায়, অন্যরূপে সেই প্রকার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা বড় অল্প। ইহাতে শিশু-চিত্তের অভিজ্ঞতারই শুধু যে আপনি যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন বা মাতৃভাষার জন্য সুধাপানে আপনার সুন্দর-ফসল-আকুলতা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়া পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন তাহাই নয়, পরমামৃত কণায় আপনার মন যে কতখানি মগ্ন তাহাও আপনার এই কাজটিতে গোপন থাকে নাই। এইরূপ অধিকারী না হইলে এমন করিয়া এ কাজ করিবার সরসতা আর কাহার হইতে পারে। যেমন ছেলেদের তেমন সকল দেশবাসীরই মনে সঙ্গীতের সুর কথায় মাখিয়া দিয়া আপনি বাঙ্গালী অন্তরের অশেষ প্রীতির ও ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। আপনার ভাষার ঝরণার সজীব ধারায় আপনার এই স্বপ্নের সত্যের গান—এই আনন্দ ও আলোর গান—সত্যই মধুময় হইয়া সার্থক হইয়াছে।"

'নূরনবী' সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর বক্তব্যের মাধ্যমে এয়াকুব আলী চৌধুরী সম্পার্কিত এই রেখায়নের উপসংহার টানছি।

"চৌধুরী এয়াকুব আলী 'মানব মুকুট'-এ যে আদর্শ মহামানুষটিকে প্রচার করেছেন, তাঁকে তিনি দেশের ছোটদের সামনে ফুলের মতো সুন্দর ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন 'নূরনবী' বইটাতে। সমস্ত মানুষসমাজকে আসুরিকতা থেকে দিব্য আলোক-উজ্জ্বল জীবনে তিনি আহ্বান করেছিলেন। তিনি জানতেন ; তাঁর এ নিমন্ত্রণকে সত্যিই সার্থক করতে হলে সংসারের কুটিল কাঠিন্যে জড়ীভূত চিত্তকে একমাত্র উদ্দেশ্য ভাবলে চলবে না। তাই তিনি শিশুদের নম্র, মধুর, নমনীয় এবং গ্রহণশীল মনের সামনে তাঁর বাণী, তাঁর আদর্শ, তাঁর আমন্ত্রণ এক অপূর্ব শতদলের সৌন্দর্যে মেলে ধরেছেন 'নূরনবী'র অনুপম ভাষাছন্দে। আমার মনে হয় সমগ্র বাংলাসাহিত্যে 'নূরনবী'র জোড়া মিলবে না।"

'নূরনবী'র এই সংস্করণে শুধুমাত্র রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করা ছাড়া লেখকের বানান পদ্ধতিকেই মান্য করা হয়েছে।

আহমাদ মাযহার
১০/১, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

আঁধার পুরী

সে অনেক দিনের কথা। তেরশ' বছর, কি তারও আগে, সেই সাত সমুদ্র পার, তের নদীর ধার, সেই সোনা হীরার গাছ, আর মুক্তা মণির ফুল—

সবই তখন ভুল।

তখন না ছিল ফুলে ফুলে পরীর মেলা, আর না ছিল সব দেশে দেশে রাজপুত্রের খেলা।

সে ছিল এক আঁধারের যুগ।

আঁধারে জগৎ জোড়া। আঁধারে আঁধার,—

পাপের আঁধার। আঁধারে মানুষ ডুবে আছে।

হাজার যুগের আঁধার বুকে আঁধারেই দিন কাটে। মানুষ গিয়াছিল ভুলে। ভুল না ভুল, না ভুলের নাই মূল। আল্লাহতালার কথা, তাই মানুষের ভুল। না কেউ আল্লাহ মানিত, না তাঁর নামাজ পড়িত। লোকের না ছিল ধর্ম, না ছিল জ্ঞান। মানুষ পূজে, কি পুতুল পূজে, গাছেরই সেজদা করে, না পাথরেই মাথা রাখে, তার কিছুই ঠিক ছিল না। এর উপর ছিল পাপ, কত রকম পাপ, —দারুন পাপের তাপ।

পাপে আর পাপে, অন্যায় আর অত্যাচারে, দুনিয়া ছারেখারে যাইতে বসিয়াছিল।

তখন আল্লার দয়া হইল—

আল্লার আলো জ্বলিল।

এই আলো ইসলাম—মানুষের ধর্ম। যিনি জ্বালিলেন, তিনি হইলেন নবী, পুণ্যের রবি, প্রেমের ফুল, আল্লার রসুল হজরত মোহাম্মদ (আল্লা তাঁকে শান্তিতে রাখুন)।

পাপময় এই পৃথিবী—এইখানে তিনি আসেন, মানুষকে ভাল করিতে; আল্লাই তাঁকে পাঠান। আসেন তিনি মানুষের কাছে, মঙ্গলের সংবাদ নিয়ে, স্বর্গের আনন্দ নিয়ে। হাজার যুগের হারাণ মানিক তিনি মানুষকে কুড়াইয়া দেন।

সে মানিক কি?

তা মানুষের ধর্ম।

সাত রাজার ধন এক মানিক তাঁর কাছে একটা কানাকড়ির সমান।

আমাদের দেশের অনেক পশ্চিমে সেই যে গলা-উঁচো পিঠ কুঁজো উটের দেশ,—সেই যেখানে আমাদের দেশ হইতে, বছর বছর হাজার হাজার লোক হজ্ব করিতে যায়, সেই আরব দেশের মক্কা নগরে হজরতের জন্ম।

সেই যে আরব দেশ, তার বুকের উপর বালি, গায় গায় পাহাড়। সেই দেশের কথা আর কি বলিব। সমস্ত দুনিয়ায় অমন দারুণ দেশ আর দ্বিতীয় নাই। আর সেই পাপের যুগে তো সেই দেশ ছিল একটা আগুনের কুণ্ড। দেশ জুড়িয়া কেবল পাহাড় আর মরুভূমি ; তাতে না আছে গাছ, না আছে পানি। ক্বচিৎ কোথাও ফুল ফসলের সবুজ মাঠ, ক্বচিৎ কোথাও বালির মধ্যে ঝরণার পানি ঝির ঝির, খোরমার বাগান, আর খেজুর গাছের ছায়া। তা ছাড়া আর সবই কেবল ধূ ধূ বালির চর। সে সব মাটি কি!—মাটি তো নয়, একেবারে আগুন। বালি আর বালিময়। যখন সেই বালি গরম হয়, তখন তার কাছে যায় কার সাধ্য? বালির উপর যে বাতাস ছুটে, তা একেবারে আগুনের হাওয়া। তা যদি কারও গায়ে লাগে, তা হ'লে সে তখনই মরিয়া যায়।

সারা দেশটাই এই রকম,—আগুন ভরা,—একেবারে হা হা খা-খা ভাব।

দেশটা যে রকম, দেশের লোকগুলাও ছিল তখন আবার তেমনি—একেবারে জানোয়ার; আগুনের দেশে আগুনের মানুষ। তাদের মনে না ছিল দয়া, না ছিল মায়া, মারামারি কাটাকাটি এ ছিল তাদের কাজ। এ ওর জিনিষ কাড়িয়া খাইত, কথায় কথায় তলোয়ার চালাইত। তারা হাসিত যেন প্রেত, রাগিত যেন সাপ। দিন রাত কেবল খুনোখুনি। মা বাপ ভাই বোন কাউকেই গ্রাহ্য করিত না। মানুষের রক্ত দেখিলে যে তাদের আনন্দ !—আনন্দে চোখ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। কথায় কথায় মানুষ কাটিত। মানুষের জানটা যেন একটা পোকার মত টিপিয়া মারিলেই হইল। মেয়েদের হাটে বাজারে বিক্রি করিত, ঠিক যেন ছাগল আর ভেড়া।

তারা আল্লাকে চিনিত না। এই যে এত বড় দুনিয়া,—এত জীব জন্তু ফল জল আর নদীর কল কল;—এই দিনের আলো, চাঁদের হাসি, আর তারার রাশি;—এই লতাপাতায় ফুলের মেলা, আর হাওয়ার খেলা; ক্ষেতে ক্ষেতে হলুদ রঙ্গের সোনার ধান, আর গাছে গাছে যত রঙ্গের পাখীর গান; উপরে ঐ আকাশের নীল চাঁদোয়া ঝলমল, আর পায়ের তলে এই সবুজ ঘাসের মখ্‌মল— একমাত্র আল্লাই যে এ সকলের কর্তা, একথা তারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তারা মাটির বড় বড় প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিত, মনে করিত তারাই জগৎ সংসারের কর্তা;—এ দুনিয়া তাদেরই হুকুমে চলে, তারাই দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; তারাই বাঁচায় আর তারাই মারে।

তোমরা কাবা ঘরের কথা শুনিয়াছ। ইহা মক্কা শরীফের বড় মস্‌জিদ,—পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান যার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, সেই ঘর। হজরত ইব্‌রাহিম পয়গম্বর আল্লার হুকুমে এই মস্‌জিদ তৈয়ার করেন। এজন্য ইহাকে 'আল্লার ঘর' বলে। সে কি আজকার কথা,—সে আমাদের নবীর জন্মের হাজার হাজার বছর আগে। আরবেরা কিন্তু সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তারা আল্লার ঘরে লাৎ, মনাৎ, হাবল এই রকম আর কত কি ছাই মাটি নাম দিয়া বড় বড় পুতুল রাখিয়া তাদের পূজা করিত ; আবল তাবল কত কি বলিয়া তাদের সামনে মাথা খুঁড়িত, মানুষ বলি দিত, আর সকলে গিয়া মদ খাইয়া কাবা ঘরের চারিদিকে জানোয়ারের মত লাফালাফি করিয়া বেড়াইত। সে এক বিদিকিচ্ছি ব্যাপার; এ সব কথা শুনিলে এখন তোমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে পাপের যুগে আরবেরা এই রকমই ছিল, দুরন্ত গোঁয়ার, আর মূর্খ জানোয়ার, একেবারে রাক্ষসের মত মানুষ।

দুনিয়াময় এইরূপ পাপ।

এখন এই যে রাক্ষসের মত মানুষ, এদের মাঝেই নবীর জন্ম। পাপের যেখানে আড্ডা, সেখানেই তিনি আসেন। যেখানে আগুন, সেইখানেই পানি। তিনি মানুষকে আল্লার কথা বলেন, আর পাপের আঁধার কাটিয়া যায়। মানুষ আল্লাকে চিনিতে পারে, পাপ হইতে রক্ষা পায়। নবী মানুষকে ধর্ম দেন, ভাল হওয়ার পথ দেখান।

তাঁহার কথায় অমন যে সব দুরন্ত আরব, তারাও এমন ভাল ভাল মানুষ হয় যে সে আর কি বলিব, যে এক একজন ফেরেশ্‌তা।

মানুষ আল্লার পথ পায়।

সেই পুণ্য কথা এমন মধুর আর চমৎকার যে যাদুর দেশের ঘুমন্ত রাজকন্যা, আর সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির কথা তার কাছে কিছুই নয়। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে রাক্ষসের দেশে মেঘ-বরণ কন্যা আনিতে গিয়া রাজপুত্র কত বিপদে পড়িয়াছিল, তাহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তোমরা অবাক হইয়া থাক ; রাজপুত্রের ব্যথায় হয়ত তোমাদের কোমল প্রাণটুকু টন্ টন্ করিয়া উঠে ; কিন্তু পাপের পাতালে শয়তানের হাত হইতে মানুষের উদ্ধারের জন্য আমাদের নূরনবী কত যে দুঃখের সাগরে সাঁতার দিয়াছিলেন, মরুভূমির আগুন হাওয়ায়, আঁধার গুহায়, তীর তলোয়ারের মুখে, অনাহারে অনিদ্রায় তিনি যে কত কষ্ট করিয়াছিলেন, তা শুনিলে তোমাদের প্রাণ একেবারে গলিয়া যাইবে।

নূতন তারা

সেই যে আরব দেশ, কূলে কূলে নীল সাগরের পানি দোলে, আর যার গায় গায় হাওয়ায় হাওয়ায় আগুনের হল্‌কা চলে, সেই আরব দেশের যে বড় শহর—তার নাম মক্কা শরীফ। মরুভূমির কোলে পাহাড়ের তলে মক্কা শহর। এই মক্কা শরীফের কোরেশ বংশ সমস্ত দেশে মান্যমান, —সকল কুলের সেরা, সকল দলের বাড়া, এই কোরেশ বংশ। এই কোরেশ কুলে হাশেম গোষ্ঠির আবদুল মোতালেব,—তিনি ছিলেন কুলের প্রধান, দলের সরদার; কুলে শীলে, জ্ঞানে গুণে, মান মর্যাদায় তিনি ছিলেন সকল কোরেশের মাথার মণি। তাঁর ছোট্ট ছেলে আবদুল্লা। যেমন রূপ, তেমনি গুণ; তাঁর রূপ যেন ফাটিয়া পড়িত। যে দেখিত অবাক হইত; অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত।

তিনি আমাদের নূরনবীর বাপ, আর জননী হইতেছেন আমেনা খাতুন। তিনিও ছিলেন বড় ঘরের মেয়ে—ওহাবের কন্যা, একেবারে মায়া মমতায় গড়া।

হজরত জন্মেন রবিউল আউয়াল মাসে, চাঁদের ১২ই তারিখে, সোমবারের ঠিক সকাল বেলা, সে বড় মধুর সময়ে—বড় এক মহা মুহূর্তে।

সমস্ত পৃথিবীতে আঁধার, তার মধ্যে আলো; ধীরে ধীরে আলো ফুটে, ধীরে ধীরে আঁধার কাটে, আর ধীরে ধীরে আলোক ছুটে। জগৎ ভরিয়া তখন কি ? আর কিছু ছিল না, ছিল কেবল শান্তি, শান্তি, শান্তি। শান্তির মধুতে জগৎ ভরা, এমন সময় নবীর জন্ম।

সে যেন ধর্ম সূর্যের উদয় হইল। তাঁর জন্ম হইলে তাঁর রূপে, আলোকের ঝলকে আর নূরের চমকে ঘর একেবারে ঝলমল করিয়া উঠিল। শরীরের সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া গেল। ফেরেশ্‌তারা হজরতের গুণগান করিতে লাগিলেন। বেহেশ্‌ত হইতে হুরবালারা আসিয়া হজরতের সেবা করিতে লাগিল। তাদের কত আনন্দ। বাতাস সে আনন্দ আর সুগন্ধ লইয়া মাতামাতি করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। সংবাদ পাইয়া ফুল সকল দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিল। পাখী সকল গান ধরিল। সূর্যকিরণে সারা দুনিয়া হাসিময় হইয়া গেল।

দুনিয়াময় মহা একটা হুলুস্থূল। পাপের রাজত্ব টলিয়া উঠিল। কাবা ঘরে হাবল বলিয়া যে দেবতা ছিল, সেটা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। দুনিয়ার যেখানে যত পুতুল-প্রতিমা ছিল সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। ইরান দেশের লোকেরা আগুন পূজা করিত ; কতকালের সেই আগুন। হাজার বছর ধরিয়া জ্বলিতেছে, কখনও নিবিতে দেয় নাই, সেই যে মহা আগুন তা চোখের পলকে নিভিয়া ছাই হইয়া গেল। আবার সেই দেশের নওশেরঁয়া নামে খুব বড় এক বাদশা ছিলেন; তাঁর আলীশান মহল,—মহলের চৌদ্দচূড়া আকাশে ঠেকিত ; সেই চৌদ্দচূড়া ভাঙ্গিয়া খান খান হইল। কোনখানে অতল হ্রদের কাজল জল একেবারে শুকাইয়া গেল ; আর কোথায়ও-বা নদীর পানি ফুলিয়া উঠিয়া চারিদিকে ভাসাইয়া দিল। এমনি করিয়া দুনিয়াময় মহা একটা ওলোট-পালোট—তোলপাড় হইয়া গেল।

সকলে দেখিল, নূতন তারা—আকাশে বড় এক তারা উঠিয়াছে।

সোনার চাঁদ

আসিলেন,—নূরের হাসি চোখে, চাঁদের হাসি মুখে, নবী আসিলেন ; ফুলের গন্ধ গায় মাখিয়া দিন দুনিয়ার বাদশা আসিলেন। আসিলেন তো, কিন্তু কেমন করিয়া? ফকির হইয়া ; দুনিয়ার যত অনাথ, এতিম তাদের সঙ্গে এক হইয়া, তাদের ব্যথার ব্যথী হইয়া।

কেন?—কোল জুড়িয়া বুক ভরিয়া এমন চাঁদপারা ধন,—এমন সোনার রতন,—তবু আমেনা মায়ের চোখের কোণে পানি কেন, কেমন করিয়া বলিব, কেন?—নূরনবী যে বাপহারা হইয়া আসিয়াছেন। মায়ের কোলে ত সোনার চাঁদ, কিন্তু কে জানে—বাপ গিয়াছেন কোন বনে, কি কোন রণে?—তিনি আর ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি গিয়াছিলেন বাণিজ্যে; বাণিজ্যেই তিনি মারা যান। সে নবীর জন্মের ছয় মাস আগে।

তারপর কি হইল? নূরনবীর দাদা আবদুল মোত্তালেব, তিনি করিলেন কি, হালিমা নামে একজন ধাই, তাঁর কাছে নবীকে সঁপিয়া দিলেন। হালিমা তাঁকে পালন করিবেন,—দেশের তাই ছিল তখন নিয়ম। ছেলে হইলে ধাইমাতে পালন করিত। হইলও তাই; হালিমা নবীকে বুকে চাপিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। মক্কা শরীফ হইতে সে অনেক দূরে। হজরত ত এদিকে মায়ের কোল ছাড়া হইলেন, ওদিকে আবার হালিমার কি হইল, তাই শুন। সে কিন্তু বড় খুশীর কথা।

হালিমার একটি রোগা মরা গাধা ছিল। শুকাইয়া হাড় হইয়া গিয়াছিল, চাহিতে চাহিতে পড়িয়া যাইত, আজ মরে কি কাল মরে এইরূপ অবস্থা । সেই গাধার পিঠে যখন হজরতকে লইয়া হালিমা সওয়ার হইলেন, তখন সেই রোগা মরা গাধা লাফাইয়া চলিল। তার গায়ে যেন হাতীর বল হইল। রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত সে যেন উড়িয়া চলিল। মোটা তাজা সকল গাধার আগে সে বাড়ী পৌছিল।

আরও অনেক কিছু অবাক কাণ্ড ঘটিল। হালিমার দেশে আকাল পড়িয়া সকলের বড় কষ্ট হইয়াছিল। গাছপালা শুকাইয়া গিয়াছিল। মাঠে ঘাস ছিল না, কুয়ায় পানি ছিল না; ছাগল ভেড়া খাইতে পাইত না। এমন সময় হজরত সেখানে যান। আর অমনি হালিমার ঘরে সুখ উথলিয়া উঠিল, চারিদিকে সুলক্ষণ দেখা দিল। ক্ষেত খামারে ফসল হইল। যব গমে হালিমার ঘর ভরিয়া গেল। কুয়া নালিতে পানি হইল। গাছে গাছে গোছায় গোছায় রাঙ্গা রাঙ্গা খেজুর খোরমা পাকিয়া উঠিল। ছাগল, ভেড়া, উট, গাধা খাইয়া তাজা হইল। লোকের কষ্ট গেল। যেন রাজপুত্র আসায় গল্পের সেই ঘুমন্ত পুরীর সকলে চোখের পলকে চোখ মেলিয়া জাগিয়া উঠিল, যেন সিংহাসনে রাজা, হাতীশালে হাতী, আর ঘোড়াশালে ঘোড়া জাগিল; যেন হাট বাজারে হাই তুলিয়া দোকানী পসারী জাগিয়া উঠিল।

কেন এমন হইল জান? তিনি যে আল্লার দয়ার মত পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তাই তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই মঙ্গল হইত, সেখানেই হাসি ফুটিত।

হজরত বাড়ীতে থাকেন, আর হালিমার ছেলেরা মাঠে মাঠে ছাগল চরায়। হজরতের কাছে এটা মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি মজার সুখে বাড়ী বসিয়া থাকিবেন, আর তার দুধ-ভাইরা মাঠে মাঠে কষ্ট করিয়া বেড়াইবে, তাও কি হয়। হজরত ধাই মাকে বলিলেন, "আমার দুধ ভাইরা কোথায় যায়, কি করে? আমিও তাদের সঙ্গে যা'ব। তারা যা করে তাই করব।" হালিমা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু হজরত মানিলেন না। তারপর হইতে দুধ ভাইদের সাথে মাঠে যাইয়া ছাগল চরাইতেন। এমনই করিয়া চার বছর গেল।

তারপর হালিমা বিবি হজরতকে লইয়া আমেনা মায়ের কোলে দিয়া আসিলেন। আমেনা বিবি বুকের ধন বুকে তুলিয়া লইলেন। খুশী হইয়া হালিমাকে সাধ্যমত টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় বখশিস দিলেন। ছেলে দেখিয়া তার মনে আনন্দ ধরে না। সুন্দর শিশু মধুর দেহ, হাত পা যেন ননী দিয়া গড়া; চোখ দুটি ভাসা ভাসা, মায়া মমতায় ভরা, মুখে হাসি পোরা, রূপের ঝলক, পুণ্যের চমক। আমেনা বিবি হজরতকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, চোখে মুখে হাজার হাজার চুমো দিলেন। কত আদর, কত সোহাগ করিলেন।

কিন্তু হজরত বেশী দিন এ সোহাগ ভোগ করিতে পারিলেন না। ছয় বছরের সময় আমেনা জননী হজরতকে ছাড়িয়া গেলেন। ছয় বছরেই আমাদের নবী বাপ-মা হারা অনাথ হইলেন। তোমরা বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কত সুখ পাও, মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া কত মজা পাও;

বাপ তোমাদিগকে কত রকম মিঠাই সন্দেশ কিনিয়া দেন, তোমরা কত সুখে খাইয়া বেড়াও; তোমাদের মা তোমাদের কত সোহাগ করেন, কত যত্ন করেন, কত কষ্ট দূর করেন।

কিন্তু অতি ছোট কালেই হজরতের এ সব সুখ মিটিয়া গিয়াছিল।

সুখ করিতে তিনি দুনিয়ায় আসেন নাই। যাতে লোকের ব্যথার ব্যথী হইতে পারেন এই জন্যই তাঁর আসা। তিনি "রহমতুল্লিল আ'লামিন"—মানুষের কাছে মঙ্গল আর দয়া।

নিজে দুঃখে না পড়িলে ত পরের দুঃখ বোঝা যায় না! আগুনে পোড়ার কি যন্ত্রণা, যার গায়ে কখনও আগুন লাগে নাই, সে কি তা জানিতে পারে? যে রোজ দুই বেলা কোরমা পোলাও খায়, চাহিবার আগেই খাবার পায়, সে কি কখনও ক্ষুধার কষ্ট বুঝিতে পারে? সে কি বুঝিতে পারে ঐ যে দুয়ারে দুয়ারে দুঃখী কাঙ্গাল ভাতের জন্যে কাঁদিয়া বেড়ায়, তাদের কি কষ্ট! তা' বুঝিতে হইলে নিজে আগে ক্ষুধা সহিতে হয়; তবেই তাদের ব্যথার ব্যথী হওয়া যায়।

পরের ব্যথা বুঝবে যে
ব্যথা আগে সইবে সে।

এইজন্যই আল্লাতা'লা নূরনবীকে ছেলেবেলা হইতেই অনাথ করেন, কাঙ্গাল করিয়া দুঃখে ফেলেন। মানুষের যত রকম দুঃখ কষ্ট হইতে পারে, সব রকম কষ্টই তিনি সহিয়াছিলেন। সে-সব ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে।

মা বাপ তো গেলেন। এখন থাকিলেন কেবল বুড়ো দাদা আবদুল মোত্তালেব। তিনি কি করিলেন, চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে হজরতকে বুকে তুলিয়া লইলেন। বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

তোমরা মনে করিতেছ নূরনবী বুঝি এইবার দাদার কাঁধে চড়িয়া খুব কিছুদিন মজা করিবেন—তা' নয়। দাদারও ডাক পড়িল। দুই বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে আবদুল মোত্তালেব নবীকে ছাড়িয়া গেলেন। মায়ের বুক, বাপের কোল, দাদার পিঠ সবই শেষ হইয়া গেল।—আট বছর বয়সেই সব ফুরাইল।

তারপর?—তারপর আর কি হইবে,—আবদুল্লার আপন ভাই আবু তালেব, তিনি হজরতের ভার নিলেন; পরম যত্নে হজরতকে পালন করিতে লাগিলেন। নূরনবীর চাচাদের মধ্যে তিনি বড়ই ভাল লোক ছিলেন। তিনি নূরনবীকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতেন। হজরত যাতে মা বাপের কষ্ট না বুঝিতে পারেন, সর্বদা সেই দিকে নজর রাখিতেন। তিনি নিজে বড়ই গরীব ছিলেন, তবুও নিজে কষ্ট করিয়া হজরতকে পালন করিতেন।

গরীবের ঘরে গরীবের যত্নে হজরত বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। তোমরা যেমন দিনরাত খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়াও, নূরনবী তেমন হাসিখেলা লইয়া থাকিতেন না। খেলিবার জন্য তিনি আসেন নাই। আশেপাশে মানুষের কষ্ট দেখিয়া তাঁর মন কাঁদিয়া উঠিত। চারিদিকে এত অন্যায়, অত্যাচার, মারামারি, কাটাকাটি দেখিয়া তাঁর প্রাণ বেদনায় ভরিয়া উঠিত। তিনি আপন মনে নিরালায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। বসিয়া বসিয়া আপন মনে ভাবিতেন। কি যে ভাবিতেন, তা তিনিই জানিতেন। আর কেউ তার খবর রাখিত না। কখন কখন তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইতেন; অনেক দূরে মাঠ, সেই মাঠের মধ্যে চলিয়া যাইতেন; আর খোলা ময়দানে দাঁড়াইয়া আল্লার সৃষ্টি দেখিতেন।

মাথার উপর ঐ সীমাহীন আকাশ, নীল আর নীল, যত দূর চোখ যায় তত দূর নীল, কত বড়—কত বড় এ; কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় মিশিয়াছে! চারিদিকে স্বভাবের সবুজ শোভা, আকাশ ছাপিয়া ভুবন ভরিয়া আলোর মালা। এই অপার শোভার মধ্যে তাঁর মন

একেবারে ডুবিয়া যাইত! তিনি অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। কি যেন দেখিতেন, কার যেন ডাক শুনা যাইত; কি যেন দুঃখের সুরে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তিনি আকুল হইয়া পড়িতেন।

মাঠের ছেলেপেলেরা তাঁর মিষ্টিমধুর কথা শুনিয়া মজিয়া যাইত, তাঁর সঙ্গে খেলিতে চাহিত। কিন্তু তিনি ত আর খেলার জন্য আসেন নাই যে দলে মিশিয়া খেলা করিবেন। তিনি বলিতেন— "ওগো না, মিছে আমোদ-আহ্লাদ করার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি, বড় কাজের জন্য তার জন্ম।"

কটু কথা কাহাকে বলে, কেমন করিয়া গালি দিতে হয়, তা তিনি মোটেই জানিতেন না। সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা বলিতেন। সে হাসিতে জোছনা ফুটিত, মধু ঝরিত। সেই মিষ্ট কথা যে শুনিত, সে মুগ্ধ হইত, সেই তাঁকে ভালবাসিত।

তোমরা কি সকলের সঙ্গে তেমন মিষ্ট কথা বলিবে?—কেবল খেলার কথা না ভাবিয়া কাজের কথা ভাবিবে? তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে ভালবাসিতেন।

মাথার ঘাম

বছর যায় পায় পায়। নূরনবী ক্রমে চৌদ্দ বছরে পড়িলেন। আপন মনে থাকেন, আর আপন মনে ভাবেন। আবু তালেব তাঁকে বুকে বুকে রাখেন; কোন কষ্টই গ্রাহ্য করেন না। এমনি করিয়া দিন যায়।

কিন্তু আবু তালেব বড় গরীব; তাঁর দিন আর চলে না। অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। শেষে তিনি বাণিজ্যে যাওয়া ঠিক করিলেন।

মক্কা শরীফের অনেক উত্তরে সিরিয়া দেশ, সেইখানে যাইবেন। আমাদের নূরনবী তাঁর সঙ্গে চলিলেন।

কোথায় সেই সিরিয়া দেশ, কত পাহাড় পার হইয়া কত ধূ ধূ মরুভূমি পাড়ি দিয়া কোথায় যাইতে হইবে।—পথের কত কষ্ট, কত ক্লেশ। দুধের ছেলে সোনার চাঁদ সেইখানে যাইবেন, শুনিয়া ফুফু আম্মা কাঁদিয়া উঠিলেন। চাচা কাতর হইয়া বারণ করিলেন। কিন্তু হজরত শুনিলেন না। চোখের পানিতে চাঁদমুখ ভাসিয়া গেল। চাচা বিদেশে যাইয়া কষ্ট করিবেন, আশে-পাশে সমস্ত লোক খাটিয়া খাইবে, আর তিনি মজা করিয়া বাড়ী বসিয়া থাকিবেন। তা কিছুতেই হইতে পারে না।

হজরত এখন বড় হইয়াছেন, ভালমন্দ বুঝিতে শিখিয়াছেন। তিনি আর এখন কুড়ের মত ঘরে বসিয়া থাকিতে চান না। তিনি দুঃখীর ধন, সকলের সঙ্গে দুঃখ করিতে চান। তিনি চান পরিশ্রম আর কাজ। ঘর আর তাঁকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তিনি আল্লার দুনিয়া দেখিতে চান। মানুষকে দেখিতে ও বুঝিতে চান। তাই তিনি চাচার সঙ্গে বাণিজ্যে চলিলেন।

চলিলেন ত উটে চড়িয়া, সঙ্গে নিলেন মালপত্র, বাণিজ্যের যত সরঞ্জাম। মরুভূমির দারুণ তাপ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না।

দেখ, তিনি কেমন কাজ ভালবাসিতেন। দুধের ছেলে হইলেও নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে চান নাই। মানুষ হইলে ননীর পুতুল হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কষ্ট ও পরিশ্রম করা চাই।

থাক সে কথা। হজরত ত বাণিজ্যে গেলেন। কিন্তু এ আর ত সেই সওদাগরের ছেলের চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরী সাজাইয়া বাণিজ্যে যাওয়া নয়, কিংবা সুখ দরিয়ার কূলে কূলে সখের তরী বাওয়াও নয় যে নহবৎ বাজিবে, ঝির ঝির বাতাস বহিবে, ঘাটে ঘাটে ডঙ্কা পড়িবে। এ সে সখের বাণিজ্য নয়। এতে ছিল মরুভূমির কূল কিনারাহীন বালির চড়া, আগুনে রোদ, আর আগুনে হাওয়া।

তার উপর আবার উটের পিঠ, কি শক্ত। এইভাবে হজরত চলিয়া যাইতেছেন। কত গ্রাম, কত নগর, কত বন উপবন ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। নূতন নূতন দেশ দেখিয়া তাঁর কত আনন্দ হইল, তা কেমন করিয়া বুঝাইব? নূতন বই পড়িলে, নূতন কথা শিখিতে পারিলে তোমাদের যেমন আনন্দ হয়, আল্লার দুনিয়া ও দয়ার নূতন নূতন পরিচয় পাইয়া তাঁর মনেও তেমনি আনন্দ ধরিতে ছিল না। মরুভূমির আশপাশ, বালি বাতাস সবই আগুন। সে আগুনের মাঝে মাঝে ঝরণার পানি ঝির ঝির, একেবারে আল্লাতা'লার দয়ার ধার; তা দেখিতে দেখিতে আল্লার কথায় তাঁর বুক ভরিয়া গেল।

তিনি দেখিলেন তাঁর দেশের যত লোক সেই আল্লাতা'লাকে ভুলিয়া গিয়াছে, ভুলিয়া পুতুল পূজা করিতেছে ; মানুষ হইয়া পশু হইয়াছে। কত মিথ্যা, কত ফাঁকি, কত অন্যায় আর অত্যাচারে দেশ পুড়িয়া যাইতেছে। দেখিয়া মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ! মানুষ কিসে ভাল হয়, কেমন করিয়া মানুষের এই পাপ তাপ দূর করা যায়, এই চিন্তায় তিনি আকুল হইলেন।

তারপর হজরত দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যায়—কিছুদিন যায়। হজরত আবার বাণিজ্যে গেলেন। দক্ষিণে এমন দেশে—সেও অনেক দূর, মরুভূমির পথ, সেখানে তাঁর যে বীর চাচা হামজা ভারি পালোয়ান—তাঁরি সঙ্গে বাণিজ্যে গেলেন। আরও কত কত দেশ দেখিলেন ; প্রাণে আরও কত কষ্ট হইল।

তারপর কিছুদিন পরে আবার ঘরে ফিরিলেন। আবু তালেবের বুক জুড়াইল।

আবার কিছুদিন যায়।—হজরতের চাচা আবু তালেব বড় কষ্টে পড়িলেন ; দিন আর চলে না। একবেলা খান, আর হয়ত দুইবেলা খাওয়া জুটে না। দেখিয়া নূরনবীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি চাচার দুঃখ দূর করিবেন।

তখন তিনি কি করিলেন? একজনের ছিল কতকগুলি ছাগল; সেই ছাগল চরাইতে গেলেন। পাহাড়ে পাহাড়ে ছাগল চরান। তাতেই পয়সা পান। আর তাতেই কোন রকমে দিন যায়।

দিন দুনিয়ার বাদশা তিনি,—তিনি রাখাল সাজিলেন।

কোন কাজই ছোট নয়। কাজ করাই গৌরব। যে কাজ না করিয়া খাইতে চায়, সেই ছোট।

তারপর যায়,—আরও কিছুদিন যায়,—নূরনবী ক্রমে বেশ বড় হইয়া উঠিলেন। বাইশ তেইশ বছরের যুবক,—সোনার মুখ—সোনার কথা। তিনি কাজ করিতে চান। কাজ না করিলে দীন দুঃখীর দুঃখ দূর করিবেন কেমন করিয়া?

আরব দেশে তখন এক বিধবা রাণী ছিলেন ; তাঁর নাম খোদেজা বিবি। খোদেজা রাণীর অনেক ধন-দৌলত। তিনি রূপের রাণী, তাঁর ঘরে মণি মাণিক্যের খনি ; তিনি সোনা-দানা লইয়া খেলা করেন ; সোনার পালঙ্কে গা রাখেন, গোলাপের পানিতে গা ধোন ; শত শত দাসী বাঁদী তাঁর গায়ে চামর ঢুলায়, কত কত চাকর নকর তাঁর হুকুমে খাড়া থাকে।

এ হেন রাণী—তিনি নূরনবীর কথা শুনিলেন; গুণ শুনিয়া আকুল হইলেন।

এখন হইল কি, রাণীর একজন লোকের দরকার,—বিদেশে বাণিজ্যে যাইবে। খাঁটি ইমানদার একজন লোক চাই। কত কত লোক উমেদার হইল, কিন্তু রাণী তাদের কাউকেই পছন্দ করিলেন না। বয়সে অনেক ছোট হইলেও নূরনবীকেই এই কাজের ভার দিলেন। নূরনবীরও কাজের দরকার ; তিনি খুশী হইয়া বাণিজ্যে গেলেন।

বড় ঘরের ছেলে, চাকরি করিলে মান যাইবে, এমন গুমর তিনি করিলেন না।

পরের চাকরিতে যাইতে দেখিয়া চাচা চোখের পানি ফেলিলেন, ফুফু আম্মা কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু তা' বলিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে ত চলে না।

হজরত বাণিজ্যে গেলেন। উট গাধার পিঠে বোঝা বোঝা মালপত্র ও লোকজন লইয়া বাণিজ্যে গেলেন। বাণিজ্যে রাণীর অনেক লাভ হইল।

এখন ভাবিয়া দেখ, সেই দুরন্ত রোদ, পাহাড় আর মরুভূমি তার মধ্যে কাজ করিয়া বেড়াইতে নবীর কতই-না কষ্ট হইত। পাথরে ঠেকিয়া হয়ত কোমল পায়ে রক্ত ঝরিত, রোদে তাঁর সোনার মুখ কালী হইত, ক্ষুধায় হয়ত তিনি কাতর হইতেন। কিন্তু কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নাই।

এই সমস্ত কষ্টে তিনি বড় হইয়াছিলেন। কষ্ট করিলেই শক্তি বাড়ে। এই যে এত বড় বড় সব গাছ দেখ, ও গুলির মাথার উপর দিয়া কত কত ঝড় বাদলা বহিয়া গিয়াছে, তবে ত উহারা এত বড় ও শক্ত হইয়াছে। এই যে সব বড় বড় বট গাছের ডালে ডালে পাখীরা বাসা বাঁধে, রোদের সময় পথের লোক ছায়ায় বসিয়া শরীর জুড়ায়—অনেক ঝড়ের দাপট, অনেক বৃষ্টির সাপট সহিয়া তবেই উহারা পরের আশ্রয় হইয়াছে।

কোটী কোটী মানুষের বোঝা নবীর ঘাড়ে, নবী পাপীকে উদ্ধার করিবেন। তাই তিনি দুঃখের মধ্যে বাড়িয়াছিলেন।

প্রকাণ্ড মরুভূমি, বড় বড় পাহাড় ; তার উপরে তিনি বেড়ান; তাঁর মনের কপাট খুলিয়া যায়।

তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। তোমাদের মত তিনি স্কুলেও যান নাই, বইও পড়েন নাই।

তা বলিয়া কি ? তাঁর মন ছিল খুব বড়, জ্ঞান ছিল খুব বেশী। তিনি গাছে গাছে লতায় পাতায় আল্লার লেখা পড়িলেন। ফলে, তারায় তারায় আল্লার পরিচয় পাইলেন। মানুষ আল্লাকে ভুলিয়াছে, আর পাপ করিতেছে দেখিয়া তাঁর মন কাঁদিয়া উঠিত। কি করিলে মানুষের ভাল হয় সেই চিন্তায় তিনি পাগল হইতেন।

গুণের নিধি

ফুলের গন্ধে বাতাস মাতে; গুণের গন্ধে মানুষ ছুটে; নবীর গুণে সকল মানুষ পাগল হইল।

নূরনবী গরীব, সে কথা তো কেউ ভাবিত না। সবাই দেখিত তাঁর গুণ। কি মধুর তাঁর চালচলন, আর কি মিষ্ট তাঁর কথা। মুখে যেন মধু লাগিয়াই আছে! আর তাঁর গড়নই-বা কি !—যেন আকাশের চাঁদ। চব্বিশ বছরের যুবক, সোনার কান্তি সকল অঙ্গে ভরা। যখন রাস্তা দিয়া যান, যেন স্বর্গের আলো উথলিয়া যায়।

নবী ভাল কথা বলেন, আর কাজ করিয়া খান।

এখন সেই যে খোদেজা রাণী—তাঁর তখন চল্লিশ বছর বয়স। তিনি ছিলেন ভারি ধার্মিকা মেয়ে। নবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। আরব দেশে তখন মেয়েদের যে দুরবস্থা !—বিধবাদের ছিল কষ্টের একশেষ ! তাদের আর বিবাহ হইত না।

নবী তাদের দুঃখ ঘুচাইবেন।

রাণী ছিলেন নিতান্ত ভাল মানুষ। তিনি কেবল আমোদ করিয়াই দিন কাটাইতেন না। অনেক ভাল ভাল বই পড়িতেন। তাহাতে তাঁর অনেক জ্ঞান হইয়াছিল।

তিনি বুঝিয়াছিলেন, হজরত পয়গম্বর, সকল মানুষের সেরা। তাই অত বড় রাণী, তিনি নবীর দাসী হইলেন।

রাণী কি বুঝিলেন ?—তিনি দেখিয়াছিলেন এক স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখিলেন সোনার চাঁদ; আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সেই চাঁদ যেন নামিয়া আসিল ; আসিয়া তাঁর কোলে উঠিল। চাঁদের যে আলো !—আলোয় জগৎ আলোময় হইয়া গেল। এই চাঁদ নবী, আলো তাঁর ধর্ম ; ধর্মে তিনি জগৎ ভরিবেন।

যাক্ সে কথা। বিয়ে তো হইল; কিন্তু হজরত কি করিলেন ? রাণীর অগণন ধনদৌলত তাঁর পায়ে ; তিনি তা পা দিয়াই ঠেলিয়া ফেলিলেন।

সুখ করিতে তো তিনি আসেন নাই। তিনি দুঃখীর ধন। টাকা দিয়া সুখের বাসর সাজাইলেন না। সমস্তই দীন-দুঃখীকে বিলাইয়া দিলেন।

এখন মানুষের কিসে ভাল করিবেন, তাই হইল তাঁর কাজ। দীন দুঃখী যারা, তাদের তিনি সান্ত্বনা দিতেন। পাড়ায় হয়ত কারও ব্যারাম হইয়াছে, অমনি সেখানে দৌড়িয়া যাইতেন, যাইয়া তার সেবা করিতেন, কত রকম বল ভরসা দিতেন। কারও হয় তো কোন বিপদ, অমনি সে নবীর কাছে আসিল। কি করা যায়? তাই তো! নবী উপদেশ দিতেন, তাতেই তার কাজ হইত।

লোক যে তাঁকে বিশ্বাস করিত, তা আর বলিবার নয়। সকলে তাঁকে 'আমীন' বলিয়া ডাকিত; আমীন কিনা 'বিশ্বাসী'। কারও কোন জিনিস ভাল করিয়া রাখা দরকার, সে তা নবীর কাছে আনিয়া রাখিত। তিনিও তা এমন করিয়া রাখিতেন যে, কারও একটু ক্ষতি হওয়ার জো ছিল না। চাহিতে আসিলে যেমন জিনিস তেমনই ফিরাইয়া দিতেন।

পাড়াপড়শীর মধ্যে তো অনেক সময়ই ঝগড়া হইত। সে আরবদের ঝগড়া তো আর সোজা নয়! ঝগড়া বাধিলেই খুনোখুনি। অনেক সময় অনেক ঝগড়া নবীই মিটাইয়া দিতেন।

একবার হইল কি, সেই যে কাবাঘর,—সেই ঘর মেরামত করার দরকার হইয়া পড়িল। কত শত বছরের ঘর তার তো ঠিক নাই। অনেক জায়গায় দেয়ালের গোড়াই আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। উপরের ছাদও অনেকখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সময় এখান দিয়া পানি পড়ে, ওখান দিয়া পানি পড়ে, এই রকম অবস্থা।

তখন বড় বড় সব কোরেশ—তারা সব ঠিক করিল যে কাবাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক, ভাঙ্গিয়া আবার নূতন করিয়া গড়া যাউক। প্রথমে ত অনেকেরই ভয় ভয় করিতে লাগিল; কে ঘর ভাঙ্গিবে আর কি বিপদ হইবে। শেষে সকলেই ভাগাভাগি করিয়া দেয়াল ভাঙ্গিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে চার দল প্রধান। কাজেই চার ভাগে কাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে ঘর দেয়াল সবই ভাঙ্গা হইয়া গেল, আবার নূতন করিয়া ঘরের পত্তন হইল। ঘর দেয়াল সব উঠিয়া গেল। যেমন কাবা আবার সেইরূপ হইল। ইহারই মধ্যে হঠাৎ বাধিয়া উঠিল মস্ত এক বিবাদ।

সে বিবাদ আর কিছুই নয়, একখানা পাথর লইয়া। কাবা ঘরের মধ্যে ছিল এক পাথর। সে পাথরের নাম "কাল পাথর।" ভারী দামী সেই পাথর, সকলেই খুব ভক্তি করিত। ঘর মেরামতের সময় সেই পাথর সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল। এখন যেখানকার পাথর সেখানে রাখিতে হইবে। তাই কথা উঠিল, কে সেই পাথর রাখিবে। যে রাখিবে, তার কিন্তু ভয়ানক মান বাড়িবে। কাজেই পাথর রাখা লইয়া লাগিল এক দারুণ বিবাদ। চার দলে তখন মারামারি। মাসের পর মাস ধরিয়া লড়াই। কত বড় বড় বীর যে মারা পড়িল তার ঠিক নাই। শেষে সকলে দেখিল—তাই ত, এই সামান্য বিষয় লইয়া এত খুনোখুনি। এস আপোষে নিষ্পত্তি করা যা'ক।

ঠিক হইল—অমুক যে দরজা, পরদিন ঐ দিয়া যে প্রথমে বাহির হইবে, সেই এই বিবাদের মীমাংসা করিবে। সে যা বলে, তাই মানিতে হইবে।

সকাল বেলা সেই দরজা দিয়া বাহির হইলেন আর কেউ নয়, আমাদেরই হজরত। কোরেশেরা ত লাফাইয়া উঠিল, বলিল, "ঠিক হইয়াছে, ইনি খুব ভাল লোক; ইনি যা বলেন, তাই আমরা মানিয়া লইব।"

হজরত সকল কথা শুনিলেন, শুনিয়া গায়ে চাদর, তাই বিছাইয়া দিলেন, আর তার উপরে রাখিলেন সেই পাথর। তারপর চার দলের চার সরদার, তাদের বলিলেন, "ধর তোমরা এক এক জনে এক এক কোণ।" তারাও তাই করিল। চারজনে ধরাধরি করিয়া সেই পাথর কাবা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। এখন যেখানকার পাথর সেইখানে রাখিতে হইবে। চাদর শুদ্ধ ত আর রাখা যায় না, একজনকে তুলিতেই হইবে। কে তুলিবে? তখন নবীই সেই কাজ করিলেন; যেখানকার পাথর সেখানেই রাখিয়া দিলেন। এমনি করিয়া নবী লোকের উপকার করিতেন। কি করিলে মানুষের ভাল হয়, দিনরাত কেবল তাই ভাবিতেন।

হারান মাণিক

ক্রমে নবী অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিসের ডাকে, কাহার টানে তাঁর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই যে দুনিয়ার দুঃখ, একি এমনি থাকিবে!—মানুষ এমনি করিয়া কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিবে, আর পাপে তাপে ছারখার হইবে! এর কি কোন উপায় নাই? কেমন করিয়া—হায়! হায়!—কেমন করিয়া এ দূর করা যায়! কি করিয়া মানুষকে ভাল করা যায়, সেই কথাই কেবল তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

এই দুনিয়ার কর্তা কে? কার এবাদত করিব? কার কাছে মাথা নোয়াইব? কে সে দয়ালু প্রভু, কার দয়ায় এ আগুন নিভান যাইবে, সেই চিন্তায় পাগল হইলেন।

কে যেন থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া যায়! চোখের সামনে খেলিয়া যায়! বাতাসে কার ধ্বনি আসে—আকাশে কার আলো ভাসে। কে সে? কোথায়?

নবী পাগল হইয়া পড়িলেন।

তাঁর খাওয়া-দাওয়া ঘুচিয়া গেল; আরাম বিরাম দূর হইল, ঘর-সংসার- স্ত্রী-পরিবার, কাজ কারবার কিছুই আর তাঁর ভাল লাগে না। তিনি বাড়ী ছাড়িলেন, ঘর ছাড়িলেন, লোকের সঙ্গ ছাড়িলেন; বাড়ী হইতে অনেক দূরে হেরা নামে এক পাহাড়, সেই পাহাড়ে এক গুহা—মানুষ নাই, জন নাই—সাপ থাকে কি বাঘ থাকে, তার ঠিকানা নাই, অজানা অচেনা এমন এক আঁধার গুহায় যাইয়া ধ্যানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মাছ যেমন পানির মধ্যে ডুবিয়া থাকে, ভাবের মধ্যে তেমনি করিয়া তিনি মজিয়া গেলেন। ক্বচিৎ কখনও দুই তিন দিন পরে বাহিরে আসিতেন, আসিয়া কিছু খাইয়া যাইতেন। তা ছাড়া সকল সময়েই সেখানে থাকিতেন। সুখ, শান্তি, আরাম, বিরাম, ভয়, ভাবনা সকলই ভুলিয়া মানুষের মঙ্গলের জন্য কাঁদিতে আর ভাবিতে লাগিলেন।

সেই ঘুমন্ত পাতালপুরে বসিয়া তিনি কি ভাবিতেন, সেখানে তিনি সাত রাজার ধন কি মানিকের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই নিবিড় আঁধারে কিসের হিরণ কিরণ দেখিতেন, তা তিনিই জানিতেন। দেশ ভুলিয়া, দুনিয়া ভুলিয়া, আপন ভুলিয়া, সকল ভুলিয়া তিনি তখন কোথায় ছিলেন, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারিব না। ধ্যানের মধ্যে তিনি ডুবিয়াছিলেন, দুনিয়ার কিছু তাঁর কাছে পৌঁছিত না।

এমন করিয়া বছরের পর বছর—কত বছর ঘুরিয়া গেল। কোরেশপুরের ঘরে ঘরে কত আনন্দের বাঁশী বাজিল; মাথার উপরে কত চাঁদের হাসি ঝরিল; আশেপাশে কত ফুলের হাসি ফুটিল, কত পাখী গান করিল; তিনি তেমনি রহিলেন। স্থির অচল, ভাবে ভোর; তাঁর চোখেমুখে সকল অঙ্গে আলোকের ঝলক—আনন্দের খেলা।

অবশেষে এক শুভক্ষণে সকল আঁধার কাটিয়া গেল; সেই নিঝুম পাতালপুরে গভীর আঁধারে বেহেশ্‌তের বাতি জ্বলিল; আল্লার আলো ফুটিল। নবীর মন সত্য পুণ্যের সোনার কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাজার যুগের হারান মানিক তিনি ফিরিয়া পাইলেন।

তিনি জানিতে পারিলেন এই দুনিয়ার কর্তা আল্লাতা'লা। তিনিই বানাইয়াছেন, তিনিই পালেন, মারেন। তিনিই সকল রাজার রাজা। কেউ তাঁর সমান নাই, কেউ তাঁর শরীক নাই; তাঁর রূপ নাই; ছবি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই; তাঁর দয়ার অন্ত নাই, স্নেহের শেষ নাই। সে একমাত্র আল্লাতা'লা। তিনিই সকল বড়র বড়। সেজদা কেবল তাঁকেই করা যায়, আর কাউকেই নয়। তাকেই কেবল ডাকিতে হইবে। তবেই দুঃখ ঘুচিবে, পাপ যাইবে, সুখ আর শান্তি মিলিবে।

আল্লার ফেরেশ্‌তা জিবরাইল—যিনি নবীদের কাছে আল্লার হুকুম লইয়া আসেন, সেই জিবরাইল ফেরেশ্‌তা আসিয়া তাঁহাকে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। যেমন করিয়া আঁধারের পরে ধীরে ধীরে আলোক ফুটে, আলোক পাইয়া ধীরে ধীরে দলের পর দল মেলিয়া পদ্ম ফুটে, নবীর মন তেমনি করিয়া খুলিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর একদিন—সাতাশ রোজার রাত্রি; দুনিয়া আঁধারে ঘেরা—গগনে পবনে আঁধারের বেড়া। সেই গভীর আঁধারে বেহেশ্‌তের দুয়ার খুলিয়া সকল ভুবন আলো করিয়া জিবরাইল ফেরেশ্‌তা নামিয়া আসিলেন। তাঁর গায়ের সুবাসে বাতাস ভুর ভুর, নূরের চমকে আকাশ ঝলমল। সারা দুনিয়া আলোকে আলোকময় হইয়া গেল। হাসি আর খুশীতে, পুণ্যে আর পুলকে গগন পবন সারা ভূবন মাতিয়া উঠিল। আল্লার আদেশ লইয়া জিবরাইল ফেরেশ্‌তা নূরনবীর কাছে নামিয়া আসিলেন।

আসিলেন, তিনি আনিলেন কি?—তিনি যা আনিলেন, তা মানুষের কাছে দয়াল আল্লার পরম দান, সকল দানের বড় দান, সকল দয়ার সেরা দয়া। পাপে-মরা জ্ঞানহারা মানুষের জীয়নকাঠি, মানুষের মঙ্গলমণি, সত্যের সোনার বাতি।—তা কোরআন শরীফ—আল্লার বাণী—কি করিলে পাপ, আর কি করিলে পূণ্য হয়, সেই কথা।

হজরত জিবরাইল বলিলেন, "হে মোহাম্মদ, আপনার উপর আল্লার রহমত হোক, আমি আল্লার ফেরেশ্‌তা, আল্লার হুকুম লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি ; আপনি আল্লার রসুল, মানুষের কাছে আল্লার কথা বলিতে, আল্লা আপনাকে পাঠাইয়াছেন।"

এই কথা বলিয়া ফেরেশ্‌তা কোরআন শরীফের এক সুরা নূরনবীকে শুনাইয়া দিলেন ; আর কেমন করিয়া একমাত্র আল্লার এবাদত করিতে হয়, সেই নামাজ পড়া তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন।

আলোর খেলা

নূরনবী ঘরে ফিরিলেন। তিনি তখন পয়গম্বর। সত্যের জ্যোতি তাঁর বুকে, ধর্মের আলো তাঁর চোখে, মানুষ রক্ষার ভার তাঁর মাথায়। আল্লা এক, আল্লা ছাড়া এবাদত করার আর কেউ নাই, আর মোহাম্মদ তাঁর রসুল, এই কথা মানুষকে বলিতে হইবে, আর তাই যদি মানুষ মানে, তবেই মানুষ রক্ষা পাইবে।

হজরত বাড়ী আসিয়া খোদেজা বিবিকে এই কথা বলিলেন। শুনিয়া খোদেজা বিবি কত যে খুশী হইলেন তা আর কি বলিব ! তিনি বলিলেন, "হাঁ, এ কথা ঠিক, আমি এ মানি ; আপনাকে নবী বলে' স্বীকার করি।" এই বলিয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ' এই কলেমা পড়িয়া তিনি মুসলমান হইলেন।

সকলের আগে তিনি মুসলমান হইলেন,—সত্য-ধর্মের সোনার বাতি তিনিই প্রথমে জ্বালিলেন। তারপর মুসলমান হইলেন হজরত আলি, আবু তালেবের ছেলে হজরতের চাচাত ভাই। তারপর হইলেন জায়েদ, খোদেজা বিবির গোলাম। তখন হজরত ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন।

তিনি কোরেশদের বলিলেন, "ভাইসব, আমার কথা শুন; তোমরা যে প্রতিমা পূজা করিতেছ, ও কিছু নয়; ওতে তোমাদের ভাল হবে না। ও সব মাটির পুতুল; ওসব তোমরাই তৈয়ার করিয়াছ, তোমরাই ভাঙ্গিতে পার; ও সব মরা মাটির ঢেলা ছাড়া আর কি? না পারে ওরা খাইতে, না পারে কথা কহিতে, না আছে ওদের ক্ষমতা কিছু করিবার। তোমরা নিজ নিজ হাতে যা তৈরি করিয়াছ, তা কি কখনও তোমাদের প্রভু হইতে পারে? শুন আমার কথা, এ দুনিয়ার কর্তা কেবল আল্লাতা'লা। তিনিই সকল বানাইয়াছেন, আর তিনিই সকল মারেন। তিনি ছাড়া উপাসনা করার আর কেহ নাই। আমি তাঁর নবী, তাঁর কথা বলিবার জন্য তিনি আমাকে তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। আমার কথা শুনিলে তোমাদের সুখ হইবে।"

শুনিয়া কেহ হাসিয়া উঠিল,—বলিল, মোহাম্মদ পাগল হইয়াছে। কেহ বলিল উহাকে ভূতে পাইয়াছে, ওঝা ডাকাও। কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিল, হে মোহাম্মদ ! বেহেশ্‌তে কি হইতেছে তা নাকি তুমি দেখিতে পাও? আবার কেহ-বা রাগিয়া চটিয়া লাল হইল—ভারী রাগ।—কি এত

বড় স্পর্ধা !—কা'লকার ছোঁড়া, সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করে ! বাপ দাদার আমলের ধর্ম, তাই মিথ্যা বলে !—আমাদের যত লোক সব দোজখে গেছে !—আমরা সব পাপী। ধর ওকে মার—আচ্ছা করে জব্দ করে দাও ; এত বড় কথা।

এই দলের সর্দার হইল আবু লাহাব আর আবু জেহেল,—হজরতের দুই চাচা,—ভয়ানক গোঁয়ার, একেবারে রাক্ষসের মত তাদের স্বভাব।

সেই দিন হইতে হজরতের উপর নানা রকম ঠাট্টা-তামাসা ও অত্যাচার চলিতে লাগিল, হজরত রাস্তায় বাজারে বাহির হইলে কোরেশদের ছেলের দল তাঁর পাছে পাছে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত; হাত তালি দিত; তাঁর গায়ে ছোট ছোট ইট ফেলিয়া মারিত। পাগল দেখিলে তোমরা যেমন কর, একেবারে তাই। তিনি নামাজ পড়িতে বসিলে কেউ হয়ত তাঁর মাথায় ধূলা চাপাইয়া দিত। কেউ হয়ত তাঁর গলায় জীবজন্তুর নাড়ীভুঁড়ি দিয়া আসিত। তিনি যে পথে হাঁটিতেন, লোক সেই পথে কাঁটা বিছাইয়া রাখিত। এই বড় বড় খেজুর কাঁটা পুঁতিয়া রাখিত, যেন তাঁর পায়ে ফুটে।

কিন্তু হজরত কিছুই গ্রাহ্য করেন না। না টলেন, না দমেন। আপন মনে সকলকে ধর্মের কথা বলেন। সবারই সঙ্গে মিষ্ট মুখে কথা কন। সবাইকে ভাল কথা বলেন। এত যে অত্যাচার,—তবু তিনি কারো উপর রাগ করেন নাই। মানুষকে রক্ষা করার জন্য তিনি আসিয়াছেন, রাগ করিবেন কেমন করিয়া ; ছেলে যদি না বুঝিয়া মন্দ কাজ করে, তাহা হইলে কি বাপ তার উপর রাগ করেন ? শিশু যদি মার বুকে কিল মারে, মা কি তাকে মারিতে পারেন ? তিনি মানুষের কাছে তেমনি। তাঁর নিজের না আছে কোন সুখ, না আছে কোন দুঃখ। মানুষের সুখেই তিনি সুখী, মানুষের পাপেই তিনি দুঃখী ; এমনি তাঁর মন। কোন কষ্টই তিনি মানেন না, সবাইকে মিষ্টমুখে ধর্মের কথা বলেন।

সূর্য যখন উঠে, পাহাড়ে তার আলো বন্ধ করিতে পারে না। সত্যের যে জ্যোতি হজরত খুলিয়া দিলেন, তাহাও ঢাকা থাকিল না। অনেক ভাল লোক তাঁর কথা শুনিয়া বুঝিল ও মানিল। কলেমা পড়িয়া তাঁহারা মুসলমান হইলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন হজরত আবু বকর। সমস্ত আরব দেশে তখন তাঁর মত বিদ্বান আর বুদ্ধিমান আর কেউই ছিল না। সকলেই তাঁকে খুব ভক্তি করিত। তারপর মুসলমান হইলেন হজরত ওসমান। তিনি ছিলেন খুব ধনী। এইভাবে দেখিতে দেখিতে চল্লিশ জন লোক মুসলমান হইয়া গেল।

মায়ার ফাঁদ

কোরেশেরা দেখিল, ব্যাপারখানা তো মন্দ নয়। আমরা এত ঠাট্টা করিতেছি, কত কষ্ট দিতেছি, তবু মোহাম্মদ তাঁর কথা ছাড়েন না, তবুও লোকে তাঁর কথা শুনে। আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম লোপ পাবে নাকি ?—তারা বড় ভাবনায় পড়িল।

মোহাম্মদ চায় কি ? কিসের জন্য সে অমন করে ? নিশ্চয়ই তাঁর কিছু মতলব আছে।

তখন কোরেশদের বড় বড় সরদার—আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান এরাই-না সব মিলিয়া করিল কি, এক যুক্তি আঁটিল ; যুক্তি আঁটিয়া ওতবা নামে তাদের দলের একজন, তাকে হজরতের কাছে পাঠাইয়া দিল। রাজপুত্রকে মারিবার জন্য রাক্ষসী মায়ার ফাঁদ পাতিয়াছিল—হজরতকে ভুলাইবার জন্য ওতবা লোভের ফাঁদ পাতিল। সে যাইয়া অনেক আদর সোহাগ দেখাইয়া বলিল, "মোহাম্মদ। তুমি আমাদের বংশের গৌরব; খুব বড় ঘরে তোমার জন্ম, আর খুব তোমার নাম; কিন্তু তুমি এসব কি করিতেছ? তুমি আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা কর, আমাদিগকে পাপী বল। তোমার কথায় আমাদের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে; আমাদের ঘরে গোলযোগ ঘটিয়াছে; বাহিরের লোক তোমার কথা বলিয়া আমাদিগকে

ঠাট্টা করে; তোমার জন্য আমরা কোথায়ও মুখ পাইব না; এখন বল দেখি বাপ। তোমার মতলব কি? তুমি কি চাও? তুমি কি টাকার জন্য অমন কর? তাহলে বল, রাশি রাশি ধন দওলত তোমাকে আনিয়া দেই। যদি মান-মর্যাদা চাও, তোমাকে আমাদের দলের সর্দার করি। যদি তোমার রাজা হওয়ার ইচ্ছা থাকে তা হ'লে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানাই।

আর দেখ, রূপের জন্যই কি এইসব করিতেছ? তা হ'লে বল, জগতের সেরা সুন্দরী আমরা তোমার কাছে আনিয়া হাজির করি। আর যদি তোমার মাথার ব্যারাম হইয়া থাকে, তা-ও খুলিয়া বল বাপ! তুমি তো আমাদের পর নও, বা কিছু ফেলিয়া দিবার জিনিসও নও। তুমি আমাদের কুলের প্রদীপ, ভাল ভাল হাকিম ডাকিয়া তোমার চিকিৎসা করাই।"

হজরত বলিলেন, "আপনার কথা কি শেষ হইয়াছে?"

ওতবা বলিল, "হইয়াছে।"

"তবে শুনুন।"

এই বলিয়া হজরত করিলেন কি, কোরআন শরীফের এক জায়গা পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি নিজের কথায় কিছু বলিলেন না, কোরআন শরীফের কথা বলিয়াই উত্তর দিলেন। বলিলেন, "দেখুন, আল্লার নাম নিন। আর কোরআন শরীফ বলিয়া যে ধর্মের বই আছে তার কথা কি আপনি শুনিয়াছেন?" তার মধ্যে অনেক ভাল ভাল কথা আর আনন্দের সংবাদ আছে। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না; কেননা আপনাদের কান কালা, আর চোখে আপনাদের পর্দা! চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে আপনারা দেখিতে পান না। মনে যা হয় তাই করেন। যা হোক শুনুন, আমি আপনাদের মতই একজন মানুষ, আমি জানিতে পারিয়াছি, আমাদের যিনি মালিক তিনি আল্লাতা'লা! তিনি এক ভিন্ন দুই নন; তাঁর আর জুড়ি নাই। এজন্য কেবল তাঁরই এবাদত করুন আর তাঁর কাছেই সাহায্য চান। দেখুন, যারা প্রতিমা পূজা করে, পরকালে তাদের খুব কষ্ট হইবে। যারা আল্লাকে মানিবে, আর ধর্ম কাজ করিবে, তারা বেহেশ্‌তে চিরকাল ধরিয়া সুখ করিবে।"

এইসব কথা শুনিয়া ওতবা একেবারে মাতোয়ারা হইল; তার ভেলকি বাজী সব দূর হইয়া গেল। কোরআন শরীফের যে মিষ্ট মধুর কথা, এমন আর সে কখনও শুনে নাই, তার সব গোলমাল হইয়া গেল। সে হজরতকে বলিল, "বাপ, তুমি যে সব কথা বলিতেছ, সে সব বাস্তবিকই ভাল কথা; এর উপর আর কিছু বলা যায় না।" এই বলিয়া সে পিঠটান; আর কি সেখানে দাঁড়ায়! একবারে ভোঁ দৌড়; দৌড় তো দৌড়, একেবারে দলের মধ্যে যাইয়া হাজির। দলের সর্দারগণকে বলিল, "আমি মোহাম্মদের মুখে যে ভাল ভাল কথা শুনিলাম, তেমন কথা আমার জীবনে আর কখনও শুনি নাই। তার উপর তোমরা আর কোন অত্যাচার করিও না।"

শুনিয়া দলের লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ওতবাকে যাদু করিয়াছে রে, মোহাম্মদ যাদু করিয়াছে; ওর কথা কেউ শুনিও না।"

যেমন তাদের বুদ্ধি, তেমন তাদের কথা!

তারপর আর একদিন কোরেশেরা হজরতকে আবার লোভ দেখায়। মায়া রাক্ষসীর ছলনা!—সেকি আর অমনি ছাড়ে? কত ছলা-কলা করে, তার ঠিক নাই।

একবারে হয় নাই, আবার যাও; ধন-দওলতের লোভ বাবা, ফাঁদে পা না দিয়ে কি যায়! আবার সেই কথা— "ধন দওলত, রাজ্যপাট, মান মর্যাদা, লোক-লশ্‌কর, হাতী-ঘোড়া কি চাও?—তাই বল—আমরা আনিয়া দেই।"

কিন্তু আমাদের নূরনবী যে উত্তর করিলেন, তা কি চমৎকার! সে কথা শুনিলে তোমরা একেবারে অবাক হইয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, "আমি ধন-সম্পত্তি চাই না; রাজ্যপাটও চাই না, মানমর্যাদায়ও আমার কোন দরকার নাই, আল্লা আমাকে পাঠাইয়াছেন তোমাদিগকে সুখবর দিতে। আল্লার যা হুকুম, আমি তাই তোমাদের কাছে বলিতেছি, আর তোমাদের যাতে ভাল

হয়, সেই সব উপদেশ তোমাদিগকে দিতেছি। আমি তোমাদের জন্য যে মঙ্গল নিয়া আসিয়াছি, তা যদি তোমরা লও, আর আমার কথা যদি তোমরা মান, ভাল কথা; ইহকালে আর পরকালে তোমরা সুখী হইতে পারিবে। আর যদি তা না শুন তাহলে আমার তাতে কোন ক্ষতি নাই। যে আল্লা আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিব। আমাদের মধ্যে কার কথা ঠিক, তিনিই তার বিচার করিবেন ; তিনিই আমার বল ও ভরসা।"

ভাবিয়া দেখ, নূরনবী আমাদের জন্য কি কষ্ট বরণ করিলেন। টাকার আর মান মর্যাদার জন্য লোকে কি না করে। কিন্তু দুনিয়ার যত সুখ আর সোহাগ, ধন দওলত তা তাঁর পায়ের তলে আসিয়াছিল তিনি তার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। তিনি দুঃখীর ধন, জগতের সকল দুঃখীর সমান থাকিলেন। পাপ আর দুঃখ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি চির দুঃখ মাথায় লইলেন, সকলের উপরে আল্লার হুকুম তিনি বড় রাখিলেন। তোমরা কি তেমন করিবে?

চাঁদ সূর্যের কথা

হজরত কেমন নির্লোভ ছিলেন, তা তোমরা দেখিলে। এখন আমি তোমাদিগকে তাঁহার তেজের কথা বলিব।

কোরেশেরা দেখিল হজরত ধনরত্নের লোভ করেন না, মায়ার ফাঁদে পা দেন না; তখন তারা মুশকিলে পড়িল। লোকটা না অত্যাচারে ভয় পায়, না টাকা পয়সায় লোভ করে; দিন দিন লোকে তার দলে মিশিতেছে; এখন উপায় কি? বেগতিক দেখিয়া তারা এক যুক্তি ঠিক করিল, "চল একবার আবু তালেবের কাছে যাই, মোহাম্মদের নামে নালিশ করি গিয়ে, চাচার কথা কি সে আর ঠেলিতে পারিবে?" এই না ঠিক করিয়া ওতবা, শায়েরা, আরো আরো কয়েকজন কোরেশ মিলিয়া আবু তালেবের কাছে হাজির হইল। বলিল, "দেখুন, আমরা ত সবাই আপনাকে মান্য করি, কুলে মানে আপনি আমাদের মাথার মণি, সেইজন্য আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাদের একটি দুঃখের কথা আপনাকে শুনিতে হইবে। আপনার এই যে ভাই পো মোহাম্মদ,—ওঁর জ্বালায় আমরা কি করি বলুন দেখি? উনি আমাদের দেবতাকে নিন্দা করেন ; আমাদের দেবতা কিছু নয়, মরা মাটির পুতুল, এইসব কথা বলেন। এ সমস্ত কি কথা বলুন দেখি? এতে আমাদের মনে কেমন লাগে? আপনি হয় তাকে ঐ সমস্ত কথা বলিতে বারণ করুন, নয় তাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিন। উনি আর ওঁর শিষ্যেরা ফের যদি আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করেন, তাহলে আপনাকে ঠিক বলিতেছি আমরা ওদের একেবারে মারিয়া ফেলিব।"

কোরেশদের কথা শুনিয়া আবু তালেবের ভারী ভয় হইল। চাচার প্রাণ কিনা! সব তাতেই অস্থির হন। তিনি তখনই হজরতকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"দেখ বাবা! তুমি যে কোরেশদের দেবদেবীর নিন্দা কর, আর অপমান কর, এতে কোরেশেরা তোমার উপর ভারী চটিয়া গিয়াছে; তারা তোমার ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন যা করিবার তা করিয়াছ, এক্ষণে তুমি আর ওদের দেবদেবীর নিন্দা করিও না। ওদের সঙ্গে মিশিয়া কাজ কর। আর তোমার যা ধর্ম-কর্ম তা মনেই কর; সেই ভাল। বাহিরে জানাইবার দরকার কি?"

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, একথা শুনিয়া আমাদের নূরনবী খুব দমিয়া গেলেন,—ভারী ভয় খাইলেন, না? তা নয়;—এ কথায় তাঁর মনের তেজ আরও জ্বলিয়া উঠিল। টাকা-পয়সার লোভ, কি প্রাণের ভয়, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন না। ধর্মই তাঁর কাছে বড়। যা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তা তিনি করিবেনই করিবেন।—তাতে প্রাণ যায় তা-ও স্বীকার।

তিনি বলিলেন, "চাচাজান। কোরেশেরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য, আর বাম হাতে চাঁদও আনিয়া দেয়, তা–ও আমি গ্রাহ্য করিব না—আল্লা যখন আমাকে মানুষের কাছে সত্যকথা জানাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তখন যত দিন বাঁচিব, তত দিন নিজের কাজ করিব। আপনি কি মনে করেন, কারও কথায় কি কারও ভয়ে কর্তব্য ছাড়িয়া দিব ? কখনও না;—হয় আল্লার কথা বলিব, নয় প্রাণ দিব।"

অত্যাচারের আগুন

আগুন জ্বলিল; অত্যাচারের আগুন, আগুনের বেড়া, নবী সেই বেড়া–আগুনে ঝাঁপ দিলেন। মানুষের ভাল করিবেন, সেই জন্য চির দুঃখের সাগর,—সেই সাগরে সাঁতার দিলেন। কোরেশদের কথা যদি তিনি শুনিতেন, তাহা হইলে হয়ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকিতে পারিতেন; খাওয়া–পরা আমোদ–আহ্লাদে তাঁর দিন কাটিত। কোন কষ্টই তাঁর হইত না। কিন্তু মানুষের সুখের জন্য তিনি দুঃখই মাথায় লইলেন। সুখের চেয়ে ধর্মকেই বড় করিলেন।

কোরেশরা যখন দেখিল, হজরত কিছুতেই তাদের কথা শুনেন না, কোন রকমেই আর তাঁকে বশ করা যায় না, তখন তারা ভয়ানক রাগিয়া গেল, একেবারে রাক্ষসের মত নিজ মূর্তি ধারণ করিল। "কি এত বড় স্পর্ধা। আমাদের কথা মানিবে না।—দেখি তারই দৌড় কত।" এই বলিয়া তারা ঠিক করিল যে, মোহাম্মদকে যেখানেই পাও না কেন, আর ছাড়াছাড়ি নাই।

তখন হইতে এক দুঃখের কাহিনী আরম্ভ হইল। দুঃখ বলিয়া দুঃখ,—কত যে কষ্টের কথা তা আমি তোমাদিগকে বলিয়া ফুরাইতে পারিব না। তার কাছে গল্পের সেই রাজপুত্রের ব্যথার কথা কিছুই নয়। রাজপুত্রের অঙ্গ হইতে রোদে ঘাম ঝরিয়াছিল,—আর নূরনবীর অঙ্গ ফাটিয়া রক্ত পড়িয়াছিল। পাহাড়ের মধ্যে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন ; কতদিন তাঁর খাওয়া হয় নাই, কত রাত্রি তাঁর ঘুম হয় নাই। সোনার চাঁদ শিশুগণ। তোমাদেরই জন্য তিনি এত কষ্ট সহিয়াছিলেন, সেই পুণ্যকথা শুন।

আবু জেহেলের শয়তানি

সাফা নামে এক পাহাড়, তার উপর কোরেশদের মেলামেশা দল–বৈঠক। হজরত একদিন সেখানে যাইয়া আল্লার কথা বলিলেন। কোরেশেরা শুনিয়া ত আগুন। তারা তখন দেব–দেবীর গুণ–গান আরম্ভ করিল। আর তার পরের দিন আবু জেহেল নামে সেই যে শয়তান, সে আসিয়া হজরতকে গালাগালি দিল, কেবল কি গালাগালি। সেই রাক্ষস তাঁর সোনার অঙ্গে হাত তুলিল; এমন করিয়া মারিল যে তিনি মরার মত হইয়া গেলেন ; তাঁর সোনার অঙ্গ কালি হইয়া গেল।

কেউ তোমাদিগকে গাল দিলে তোমরা ফিরিয়া গালি দাও ; মারিলে মার। কিন্তু নূরনবী কিছুই বলিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, "ওগো, তোমাদের আল্লা যে আমাকে পাঠাইয়াছেন—তোমাদেরই ভালর জন্য,—তোমরা কেন আমাকে মারিতেছ?" হায়, কি তাঁর কষ্ট। আর কি তাঁর দয়া। খবর পাইয়া খোদেজা বিবি দৌড়িয়া গেলেন। হায়, হায় ! করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হজরতের অবস্থা দেখিয়া তাঁর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে বাড়ী আনিয়া তাঁর সেবা করিতে লাগিলেন।

এদিকে হজরতের চাচা হামজা,—ভারী পালোয়ান,—তিনি বাড়ী আসিয়া এইকথা শুনিলেন। শুনিয়া ত আগুন;—হজরতের গায়ে হাত তুলে—এত বড় ক্ষমতা। একেবারে লাঙ্গা

তলোয়ার হাতে আবু জেহেলের সামনে খাড়া হইলেন।—"কি রে শয়তান, তুই নাকি মোহাম্মদকে মারিয়াছিস,—এত বড় বুকের পাটা তোর? আমি যদি তখন বাড়ী থাকিতাম, তা'হলে তোকে কাটিয়া দুই টুক্‌রা করিয়া ফেলিতাম।" এই বলিয়া তিনি আবু জেহেলকে খুব করিয়া মার দিলেন। তারপর হজরতের কাছে আসিয়া বলিলেন, "বাপ ধন; আবু জেহেল তোমাকে মারিয়াছিল আমি তাহাকে আচ্ছা করিয়া শাস্তি দিয়াছি।"

হামজা মনে করিয়াছিলেন, হজরত এই কথা শুনিয়া ভারী খুশী হইবেন। কিন্তু তা হইল না। হজরত চান মানুষের মঙ্গল,—শত্রুর কষ্টেও তিনি খুশী হন না—ভাল করাই তাঁর কাজ। তিনি বলিলেন, "চাচাজান ; এর চেয়ে আপনি যদি মুসলমান হন তা হলে খুশী হই,—আল্লা এক, আমি তাঁর নবী—এই কথা আপনি স্বীকার করুন !" হামজা শুনিয়া ত অবাক ! নিজের কথা মনে নাই, কেবল ধর্মের কথাই মুখে,—সত্যই ত পয়গম্বর ! তখন হামজা কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইলেন।

ওমরের বড়াই

আর একদিন কোরেশদের বৈঠক বসিল। হামজার মত লোক মুসলমান হইয়া গেল। দিন দিন মোহাম্মদের প্রতাপ বাড়িয়া চলিল—এর একটা উপায় না করিলে ত আর হয় না। কথায় কথায় আবু জেহেলের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। হজরতের কথা যতই ভাবে, ততই তার বুক জ্বলিয়া উঠে। তার চেহারা হইল রাক্ষসের মত। সে বলিল, "কোরেশ ভাইসব, তোমরা কি এমনি থাকিবে? কিছুই করিবে না? মোহাম্মদ রোজ রোজ আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করিবে, বাপ-দাদার গালাগালি দিবে, আমরা চুপ করিয়াই থাকিব? না, তা কখনও হইতে পারে না,—মোহাম্মদকে খুন করাই চাই,—এই আমার পণ। যে কেউ মোহাম্মদের মাথা কাটিয়া আনিতে পারিবে আমি তাকে একশ' উট আর পাঁচশ' সোনার মোহর বক্‌শিশ দিব।"

শুনিয়া ওমর লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "আমি যাইব। এ আবার শক্ত কথা কি,—এখনই তাঁর মাথা কাটিয়া আনিতেছি !"

ওমর ভারী পালোয়ান । যেমন তাঁর জোর, তেমনি তাঁর সাহস; তাঁর ভয়ে সকলেই কম্পমান। তাঁর চোখ দুটো কি,—একেবারে আগুনের গোলা।

এহেন ওমর চলিল হজরতকে মারিতে। যে শুনে সেই কাঁপে, ভয়ে দূর হইতে পালাইয়া যায়। ওমর হনহন করিয়া চলিয়াছে,—হাতে তাঁর তলোয়ার ঝক্‌ঝক্, চোখ তাঁর আগুনের মত ধক্‌ধক্। পথে একজনের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল, "ওমর, কোথায় চলিয়াছ?" ওমর বলিল, "মোহাম্মদকে মারিতে।" লোকটি বলিল, "তাই নাকি? আচ্ছা, তুমি এই ভেড়ার বাচ্চাটিকে ধর দেখি, বুঝিব তুমি কেমন বীর।" "এই কথা, এখনই ধরিয়া দিতেছি"—এই বলিয়া ওমর ভেড়ার বাচ্চাটিকে ধরিতে গেল। বাচ্চা ত লাফাইয়া-ঝাঁপাইয়া অস্থির। ওমর কিছুতেই তাকে ধরিতে পারিল না। মাঝ হইতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া সে হাঁপাইয়া পড়িল।

তখন সেই লোকটি বলিল, "বটে, এই তুমি বীর। একটা ভেড়ার বাচ্চা ধরিতে পারিলে না, আর তুমি আল্লার সেই সিংহকে মারিবে। মোহাম্মদকে মারার খেয়াল তুমি ছাড়, সে তোমার কর্ম নয়।"

শুনিয়া ওমর তাকে মারিতে তলোয়ার তুলিল ;—সে ভয়ে পালাইয়া গেল।

ওমর চলিল। সকলে ভয়ে অস্থির। মুসলমানেরা ত হজরতকে লইয়া একঘরে একত্র হইয়াছেন। সকলের মনে ভাবনা কি হয়। হজরত কিন্তু স্থির। তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি আল্লার

বলে বলী; তাঁর আবার ভাবনা কি? ওমর যাইয়া দরজায় ঘা মারিল। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন,—কি করা যায়। হজরত আলী আর হামজা, তাঁরাও খুব বীর কিনা, তাঁরা তলোয়ার লইয়া বাহির হইতে চহিলেন; ওমরের সঙ্গে লড়াই করিবে; তার সাধ্য কি যে হজরতের গায়ে হাত তুলে? তাঁরা ত ওমরের চেয়ে কম ছিল না; এক একজন মস্ত পালোয়ান। তাঁরা ত ও কথা বলিবেনই। কিন্তু হজরত কাউকে বাহির হইতে দিলেন না; আল্লার নাম করিয়া নিজেই দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁরি মাথা কাটার জন্য খোলা তলোয়ার হাতে আজরাইলের মত ওমর খাড়া। কিন্তু হজরত একটুও ভয় করিলেন না। সকল কাজে আল্লাই তাঁর ভরসা, মানুষকে তিনি ভয় করেন না। তিনি যাইয়া ওমরের হাত ধরিলেন; আর অমন যে বীর, সে একেবারে কাবু হইয়া পড়িল, তার গায়ে একটুও জোর রহিল না। আর এত যে বল বীর্য আর লম্ফ-ঝম্ফ তা কোথায় ফুঁ হইয়া উড়িয়া গেল। হজরতের তেজে সে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তখন ওমর বুঝিল যে, বাস্তবিকই হজরত সত্য পয়গম্বর; তা না হলে তাঁর এত তেজ! তবে আর আমি তাঁকে মানিব না কেন? এই ভাবিয়া ওমর কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইলেন। হজরত তাঁকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ধর্মের বলের কাছে গায়ের জোর চিরদিনই এই রকম হার মানে।

পাহাড়ে বন্দী

ওমর হইলেন মুসলমান! কোরেশদের আশা-ভরসা সব মাটি। ভয়ে তারা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপে; ওমরকে দেখিলে দূর হইতে পলাইয়া যায়।

ভয়ে ভয়ে দিন কাটে। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। এক ওমরের ভয়ে ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলে না। উপায় করা চাই। হাজার সে বীর হউক, তবু সে একা; আর আমরাই সব। আমরা কি ওমরের ভয়ে মোহাম্মদকে ছাড়িয়া দিব? কখনই না। কোরেশেরা যতই এইকথা ভাবে ততই তাদের বুকে সাহস বাড়ে, রক্ত গরম হয়—মোহাম্মদকে মারিতে হইবে।

শেষ চেষ্টার জন্য তারা আর একবার আবু তালেবের কাছে গেল—উদ্দেশ্য ভয় দেখান। তারা বলিল, "দেখুন, আপনি ত আমাদের কথায় কান দিতেছেন না। ভাল মানুষ আপনি, নিজের ভাবেই আছেন। কিন্তু বেশী দিন ত আর আপনার এইভাবে থাকা চলে না। আপনার ভাইপো যে রকম বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছে, তাতে আমরা ত আর এরূপ নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না। আপনি সোজা লোক,—তাই মোহাম্মদের কথায় গলিয়া যান। এখন বিপদ যে আপনার ঘাড়ে আসিয়া চাপে তার কি? আমরা ত সাহেব, আর আপনার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারি না। এখন হয় আপনি মোহাম্মদকে আমাদের হাতে দিন, নয় আজ থেকে আপনার সঙ্গেও আমাদের বিবাদ। আমরা মোহাম্মদকে খুন না করিয়া ছাড়িতেছি না ; কাজেই আপনি যখন তাকে আশ্রয় দিতেছেন, তখন আপনিও আমাদের শত্রু। এখন কি করিবেন বলুন?"

চোখ মুখ লাল করিয়া ভারী রাগের সঙ্গে তারা এইকথা বলিল। তখনি মারে আর কি?

আবু তালেব বলিলেন, "তা বেশ, আমি ভাবিয়া দেখি ; যে-কথা হয় কাল বলিব। তাকে ধরিয়া দেওয়া ত সহজ কথা নয়।"

"আচ্ছা তাই", এই বলিয়া কোরেশেরা ফিরিয়া গেল। এদিকে আবু তালেব হজরতকে ডাকাইলেন ; কোরেশদের কথা খুলিয়া বলিলেন।

হজরত কি উত্তর দিবেন তা ত তোমরা জানই। আগেও যে-কথা, এখনও সেই কথা।

তিনি বলিলেন, "চাচাজান! আল্লার যা হুকুম, তাই আমি লোকের কাছে বলিতেছি। এ কাজ হইতে কেউ আমাকে ফিরাইতে পারিবে না। যদি আপনি ছাড়েন, তা হ'লে আল্লা আছেন। তিনি

আমাকে সাহায্য করার জন্য তৈয়ার। আপনি জানিবেন—সত্যেরই জয় হইবে। যারা প্রতিমা পূজা করে সেই সব পাপী আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

দেখ নবী কেমন ধর্মবীর! কি তাঁর তেজ—আর বিশ্বাস! ধর্মের জন্য তিনি প্রাণ দিবেন, এই তাঁর পণ। কেবল তাই নয়। তিনি জানেন যখন তিনি ধর্মকাজ করিতেছেন, তখন একা বলিয়াই যে অক্ষম তা নয়, তাঁরই মহাবল। আল্লা তাঁর সহায় হইলেন, তাঁর জয় হইবেই।

এ-কথা যে সত্য, তা তোমরা কিছু কিছু দেখিয়াছ। অপেক্ষা কর, আরও দেখিতে পাইবে। নূরনবীর লোকজন, জোর-বল কিছুই ছিল না। তিনি যখন ধর্মের কথা বলা আরম্ভ করেন, তখন তিনি কি ছিলেন? একা,—নিতান্ত একা। তাঁর উপর এত অত্যাচার তবু দেখ কত লোক তাঁর শিষ্য হইতেছে। অমন যে ওমর যাঁর মত পালোয়ান আর কেউ নাই—সেই ওমর কিনা তাঁর মাথা কাটিতে গিয়া তাঁরই পায়ে আশ্রয় নিলেন। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি?

চিরকালই এই রকম হয়। তুমি গরীব, তুমি একা, এটা কোন কাজের কথাই নয়। যা ধর্ম, যা সত্য তাই যদি তুমি কর, তা হ'লে তোমার চেয়ে বলবান আর কেহ নাই। কেউ তোমার সঙ্গে না থাকিতে পারে, কিন্তু সকলের বড় যিনি, সেই আল্লা তোমার সঙ্গে আছেন। আজ তুমি ছোট হইতে পার, কিন্তু শেষকালে তোমার জয় হইবেই হইবে। আল্লাই তার পথ করিয়া দিবেন।

এখন যা বলিতেছিলাম, তাই শুন।

হজরতের কথা শুনিয়া আবু তালেব আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "হাঁ বাবা, তা বৈ কি। তোমার মত তুমি কাজ করিয়া যাও; আমি যত দিন আছি, শত্রুর সাধ্য কি তোমার কিছু করে।"

তখন কোরেশদের আবার বৈঠক বসিল। ঠিক হইল যে, আর ছাড়াছাড়ি নাই। এবার আর কেবল মোহাম্মদকে নয়, ওঁর বংশ সমেত নাশ করা চাই। ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ আত্মীয়-স্বজন যাকে যেখানে পাও, মার। এই ঠিক করিয়া তারা সকলে মিলিয়া এক পণ করিল। পণ, পণ,—বিষম পণ। তারা পণ করিল যে, হাশেম বংশের লোকেরা যতদিন পর্যন্ত মোহাম্মদকে আমাদের হাতে ধরিয়া না দেয় ততদিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি, কথা-বার্তা, কাজ-কাম, কেনা-বেচা সব বন্ধ। থাকুক তারা মোহাম্মদকে নিয়ে,—মরিয়া গেলেও আমরা তাদের দিকে তাকাইব না। এমন কি দেখা হইলে তাদের কাউকে সালাম পর্যন্ত করা মানা।—যত কোরেশ, সকলের এই পণ। কেবল মুখের কথা নয়, তারা এক পণ-পত্র লিখিল। লিখিয়া দলের বাছা বাছা চল্লিশজন লোক তাতে সই করিল। তারপর সেই পণ-পত্র তারা কাবাঘরে টাঙ্গাইয়া দিল, যাতে দেশ-বিদেশের সব লোক এই কথা জানিতে পারে।

তা ছাড়া, কোরেশেরা এইকথা দেশের শহরের বাজারে সব জায়গায় রটাইয়া দিল। দেখ দেশবাসী, হাশেম বংশের যত লোক তারা সব আমাদের শত্রু,—আমরা তাদের একঘরে করিয়াছি। কেউ তাদের কাছে জিনিসপত্র বেচিতে পারিবে না,—বেচিলে মারা যাইবে।

কোরেশদের এই পণের কথা আবু তালেবের কানে গেল। তিনি বংশের সকল লোককে ডাকাইলেন; ডাকাইয়া বলিলেন, "ভাইসব, অবস্থা ত এই; এখন তোমরা বংশের মান রাখিতে চাও কিনা বল?" সকলে বলিল, "হাঁ, চাই বৈ কি? মানের কাছে আবার কি? মোহাম্মদকেই যদি আমরা ওদের হাতে দিলাম, তবে আর আমাদের মুখ থাকিল কৈ? কিছুতেই না। তাতে যা হয় তাই হ'ক—আপনি উপায় করুন।"

মক্কার কাছে ছিল এক ভারী কেল্লা। আবু তালেব তখন তাদের সকলকেই সঙ্গে নিয়া তারই মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তা ছাড়া আর কি করেন! জান বাঁচাইবার ত একটা উপায় করা চাই। হজরত আর তাঁর শিষ্য, আর তাঁর বংশের মত লোক, ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, পুরুষ সব গেলেন সেই দুর্গের মধ্যে—এক প্রাণীও বাদ থাকিল না।

তখন তাঁরা হইলেন বন্দী। আর তাঁদের যে কষ্ট হইল তা আর বলিবার নয়।

কোরেশেরা করিল কি, সেই দুর্গ আটক করিল। দিনরাত তার চারিদিকে পাহারা দিতে লাগিল, যেন এক প্রাণীও না বাহির হইতে পারে,—না ভিতরে যাইতে পারে। যেই বাহির হইবে অমনি মার, আর কথাবার্তা নাই,—লাগাও তলোয়ার। এমনই করিয়া কয়েকজনকে তারা কাটিয়াও ফেলিল।

তখন হইল মহা একটা আতঙ্ক। ভয়ে আর কেউ বাহির হয় না। খাবার জিনিসপত্র যা সঙ্গে ছিল, ক্রমে তা সব ফুরাইয়া গেল। এখন উপায় কি?—কেই-বা আর তাঁদের খাবার দিবে? আর কেমন করিয়াই বা পাওয়া যাইবে? চারিদিকে ত আজরাইলের মত সব খাড়া—মহাকষ্ট। জান বাঁচান দায়। বড় যাঁরা তাঁরা দু' তিন দিন অন্তর হয়ত কিছু মুখে দেন। ছেলেপিলে কি আর তা বুঝে, তাদের কান্নায় বুক ফাটিয়া যায়। ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট—সকলে মরার মত হইয়া গেল। একবেলা ভাত না পাইলে তোমাদের কেমন ঠেকে? মা বোনকে ধরিয়া মার, হাঁড়ি পাতিলা ভাঙ্গ, কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাও। আর একদিন নয়, দু'দিন নয়, তিন তিনটি বছর তাঁদের এই ক্লেশ। কোন রকমে দিন যায়।

ধর্মপথে যাঁরা থাকেন, প্রথম প্রথম তাঁদের কষ্টই হয়। কিন্তু যতই কষ্ট হউক-না কেন, তা তাঁরা সহ্য করেন, আর মনে মনে আল্লাকে ডাকেন। হজরতও তাই করিতেন। আল্লাই তাঁর ভরসা। ক্বচিৎ কখনও হয়ত কোন দয়াল লোক রাত্রিতে লুকাইয়া দুর্গের মধ্যে কিছু খাবার দিয়া আসিত। তাই খাইয়া তাঁরা বাঁচিতেন। এইভাবে অতি কষ্টে তিন বছর কাটিল।

তারপর আল্লার দয়া হইল। কোরেশদের পণ আর থাকে না—যে রাক্ষসের মত পণ, তা কি আর মানুষে রাখিতে পারে? কোরেশদের মধ্যে সবাই যে রাক্ষস এমন নয়। দুই-চার জন ভাল লোকও ছিল। তাদের মনে দয়া হইল। তারা ভাবিল যে তাইত এ বড় অন্যায় কথা! আমরা সব করি সুখ, আর এতকালের আত্মীয়-স্বজন যারা, তাদের কি না এত কষ্ট। একের জন্য এতগুলি লোককে মারিয়া ফেলা। ছোট ছোট শিশু, তাদের এই যন্ত্রণা কি আর চোখে দেখা যায়। দূর হোক ছাই, লোকগুলোকে আর কষ্ট দিয়া কাজ নাই। খুব হইয়াছে। এস আমরা পণ-পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলি।

এদিকে ভারী এক মজা হইয়াছে। সেই যে কোরেশদের পণ-পত্র,—তা আল্লার হুকুমে পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। পণের কথা, নাম-টাম সব শেষ। হজরত সেই কথা জানিতে পারিলেন। তিনি আল্লার নবী—আল্লার ফেরেশতা জিবরাইল আসিয়া সেই কথা বলিয়া দিলেন। হজরত বলিলেন সেই কথা আবু তালেবকে। আবু তালেব ভাবিলেন বেশ, এইবার বুঝা যাইবে মোহাম্মদ সত্য পয়গম্বর কি না। তিনি বাহির হইয়া গেলেন কোরেশদের কাছে। সভা করিয়া কোরেশেরা বসিয়া আছে, সেইখানে যাইয়া হাজির। তাকে দেখিয়া কোরেশেরা মহা খুশী। আবু তালেব তাদের সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছেন এই তাদের মনে। আবু তালেব তাদের ভাবেই কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "মোহাম্মদকে তোমাদের হাতে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে একটা কথা। মোহাম্মদ বলিয়াছেন, তোমাদের সেই পণ-পত্র পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে, পণের কথা নাম-টাম সব শেষ। এখন আন দেখি তোমরা সেই কাগজখানা, একবার দেখি। যদি কাগজে তোমাদের নাম থাকে, তবে আর আমার আপত্তি নাই। এখনই মোহাম্মদকে তোমাদের হাতে ধরিয়া দিতেছি।"

তখন কোরেশদের লম্ফঝম্ফ দেখে কে? তাদের মহা আনন্দ। আবু জেহেল তখনই দৌড়িয়া গেল। পণ-পত্র লইয়া হাজির। কিন্তু কাগজ খুলিয়া তো সবাই অবাক! যে কথা সেই কাজ। কোথায়-বা লেখা, আর কোথায়-বা কি? সব কাটা,—ঝুরঝুর। কাগজে একবর্ণও লেখা

নাই, সমস্তই পোকা-কাটা। দেখিয়া সকলের চক্ষু স্থির। লজ্জায় আর কেউ মাথা তুলে না। তখনই সেই কাগজখানা টুক্‌রা টুক্‌রা। সেই ভাল লোকদের একজন, তার নাম মোতএম, তিনি সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

কোরেশেরা যার যার বাড়ী চলিয়া গেল। হজরত আর সকলে বাহিরে আসিলেন। সেবারকার মত বিপদ গেল।

পাথর বৃষ্টি

দুঃখের উপর দুঃখ, দুঃখ আর যায় না। এই তিনটা বছর বন্দী থাকা, কত কষ্ট কত যন্ত্রণা; তার উপর নূতন বিপদ। বিপদ আর হজরতকে ছাড়ে না। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আবু তালেব মরিয়া গেলেন। তারপর বিবি খোদেজারও ডাক পড়িল; তিনিও হজরতকে ছাড়িয়া গেলেন। হজরতের সকল আশ্রয় শেষ হইল। তখন ভাল করিয়া আগুন জ্বলিল। এখন ত আর আবু তালেব নাই; এখন আর ভয় কি? কোরেশেরা মহা উৎপাত জুড়িয়া দিল। ভয়ানক অত্যাচার।—মক্কায় টেকা দায়। হজরতের আর আশ্রয় নাই ; আল্লাই তাঁর আশ্রয়। তিনি মক্কা ছাড়িয়া তায়েফে চলিলেন। মক্কা হইতে অনেক দূরে তায়েফ শহর—ছোট খাট শহরটুকু,—খোরমায় ভরা, আঙ্গুর বাগানে ঘেরা,—সেইখানে চলিলেন।

গেলেন সেখানে ; কিন্তু খেজুর খোরমা খাইতে নয়, আল্লার কথা বলিতে, সেখানকার লোকে তাঁর কথা শুনিবে এই আশায় এক জনের বাড়ীতে উঠিলেন। সেখানে থাকেন আর আল্লার কথা বলেন।

কিন্তু সকল খানেই শয়তানের আড্ডা। সেখানে লাত নামে মস্ত এক দেবীর পূজা। দেবীর নিন্দা শুনিয়া লোকেরা রাগিয়া গেল। হজরতের আশ্রয় ঘুচিল। তিনি এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। আজ এখানে, কাল সেখানে, পথে পথেই তাঁর ঘর। ঘর দিয়া তিনি কি করিবেন, আল্লাই তাঁর ঘর। আল্লার নামেই তাঁর আনন্দ।

তিনি পথে পথে আল্লার কথা বলেন। মানুষের মঙ্গল করাই তাঁর কাজ। কিন্তু অন্ধ সব লোক মঙ্গলের কথা বুঝিল না, পথে ঘাটে তাঁকে পাথর ফেলিয়া মারিতে লাগিল। পাগল ভাবিয়া ছেলের দল ছুটিয়া আসে, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, আর ইট পাথর ছুঁড়িয়া মারে। সোনার অঙ্গে রক্ত ঝরে, তবু তাঁর দুঃখ নাই। আয় আয় করিয়া ডাকেন ; মধুর হাসিয়া কথা কন। কেমন করিয়া তাদের ভাল করিবেন সেই কথাই চিন্তা করেন। তাঁর অঙ্গ হ'তে রক্ত ঝরে, চক্ষু বয়ে পানি পড়ে—তিনি লোকের কাছে ধর্ম ও পুণ্যের কথা বলেন। একদিন সেই শয়তান লোকেরা করিল কি ছোট ছোট পাথর, তাই ফেলিয়া মারিতে লাগিল। মারিয়া মারিয়া সেই যে সোনার শরীর, তা একেবারে জখম করিয়া ফেলিল। সারা অঙ্গ বহিয়া রক্ত ছুটিল; রক্তে তাঁর কাপড় ভিজিল; রক্তে পায়ের জুতা ভরিল। তিনি মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন; মরার মত পড়িয়া রহিলেন। মরা ভাবিয়া কাফেরেরা ফেলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

আল্লার নবী কাঁদেন।—কিসের তাঁর ব্যথা, মনের কি কথা। কি জন্য তিনি কাঁদেন। কাঁদেন তিনি দুঃখে—মনের দুঃখে কাঁদেন। তিনি বলিলেন, হায় ! এইসব লোক, এদেরই ভাল করিতে আমি আসিয়াছিলাম, আর এরা নিজের ভাল বুঝিল না।"—

তিনি তাদের জন্য মধু আনিয়াছিলেন, বিষ বলিয়া তারা ফেলিয়া দিল। কেন তারা এমন হইল,—এই তাঁর ব্যথা।

গায়ের ব্যথা তাঁর ব্যথাই নয়,—লোকের দুঃখেই বুক ফাটে। তায়েফের সেই সব লোক এত দুঃখ দিল যারা,—তাদের তিনি না গাল দিলেন, না কিছু। কত জনে শাপ দেয় তিনি তার কিছুই

করিলেন না। তিনি শুধু আল্লার কাছে ব্যথা জানাইলেন; বলিলেন, "আল্লাতা'লার সহায় ছাড়া আমার কেউ নাই, কেবল তুমিই আমার সহায় আর আশ্রয়। তুমি যদি সখা থাক, কোন দুঃখই আমি গ্রাহ্য করি না।"

মানুষ কেন ভাল হয় না, সেই ব্যথা তাঁর মনে। এই ব্যথা নিয়া তিনি মক্কায় ফিরিলেন। পথে কত ক্লেশ—সেই কাঠ ফাটা রোদ, সেই রোদে মাঠে মাঠে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় বুক ফাটে;—তবু প্রাণে সেই বেদনা, সেই বেদনায় তিনি কাতর।

তোমরা কি তেমন হইবে? মানুষের ভালর জন্য তাঁর মত তোমরাও কি কষ্ট করিবে?

আঁধারে আলো

হিম শিম্ শিম্ আঁধার রাত, আঁধারে আকাশ ছাওয়া ; আলো নাই, বাতাস নাই, শব্দ গন্ধ নাই। গাছে গাছে পাতা নড়ে না, পাতার কোলে ফুল হাসে না, পথ পাথার চেনা যায় না—এমন রাত। সে রাতও প্রভাত হয়, আবার নীল আকাশে ঝল্‌মলিয়ে সূর্য উঠে, সোনার কিরণে ভুবন হাসে।

কাজের বেলায়ও এইরূপ হয়। হজরতের ঘর নাই, দুয়ার নাই, অর্থ নাই। কোরেশের অত্যাচার,—অত্যাচারে প্রাণ যায়, মক্কায় টেকা দায়,—এমনি অবস্থা।

তা হ'ক, তবু সত্যের জয় হইল,—ধর্মের আলো জ্বলিল।

যে ধর্ম ধরিয়া কাজ করে—
যে বিপদে টলে না,

ঠাট্টায় গলে না,
লোভে ভুলে না,
শেষ কালে তারই জয় হয়।

চারিদিকের লোক নবীর খবর লওয়া শুরু করিল। মক্কার মানুষ তাঁকে মানিল না; তা না মানুক। মদীনার লোক তাঁর কথা শুনিল, শুনিয়া মাথায় তুলিয়া লইল। ধনী, মানী, জ্ঞানী মদীনার যত লোক, বাছা বাছা সরদার সবাই নবীর উম্মত হইল। তারা বলিল, "হজরত, আপনি চলুন আমাদের কাছে আর এই পাপ জায়গায় থাকিয়া আপনার কাজ নাই। আমরাই আপনাকে দেখিব; আপনার কাজ করিব— সুখে দুঃখে আমরা আপনার সঙ্গী। আপনার জন্য আমাদের জীবন,—ইসলামের জন্য আমাদের প্রাণ। চলুন আপনি।"

হজরত বলিলেন, "তোমাদের যা সত্য, আমারও সেই সত্য। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত—তোমাদের কবর আমার কবর, আমরা এক।" এই সত্যে তাঁরা বদ্ধ হইলেন। ঠিক হইল যে নূরনবী মদীনায় যাইবেন,—সেখানে ধর্ম প্রচারের সুবিধা হইবে। তখন সমস্ত মুসলমান এক এক করিয়া মদিনায় চলিলেন। গেলেন সকলে; থাকিলেন কেবল নূরনবী, হজরত আবু বকর আর হজরত আলী। হজরত যাইবেন সবার শেষে, আর তাঁরা তাঁর সঙ্গে যাইবেন।

খবর শুনিয়া কাফেরদের মহারাগ। এত বড় কথা। দলে বলে মোহাম্মদ বড় হইবে।—তা কিছুতেই না। তারা আগে নবীকে মারিয়া ফেলিবে। নির্ঘাত পণ—কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নাই।

এক রাত্রে তারা দল বাঁধিয়া হজরতের ঘরে গেল—তাঁকে মারিতে। মারিবেই মারিবে। কারো হাতে ছোরা, কারো হাতে তলোয়ার, বিছানার উপরে কাটিয়া ফেলিবে। কিন্তু কোথায় হজরত? হজরত নাই।—বিছানায় শোওয়া আলী। কোরেশেরা সব বেকুব; আবু জেহেল, আবু লাহাবের মুখ চুন, লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট।

কোথায় হজরত?

হজরত চলিয়া গিয়াছেন। আল্লা যাঁকে রাখে, মানুষে তাঁর কি করিবে? আল্লার হুকুমে তিনিও সেই রাত্রেই ঘর ছাড়িলেন। কোরেশেরাও আসিল, তিনিও বাহির হইলেন তাদের নিকট দিয়াই চলিয়া গেলেন। না কেউ দেখিতে পাইল, না কিছু করিতে পারিল।

নবী গেলেন হজরত আবু বকরের ঘরে। যাওয়া ত আর সোজা নয়,—চারিদিকে কোরেশেরা খ'ড়া। যে নবীকে ধরিয়া আনিবে, সে শ'ও উট পুরস্কার পাইবে।

হজরত রাতারাতি মক্কা ছাড়িলেন। তাঁর সঙ্গে শুধু আবু বকর। কত সাধের জন্মভূমি—তা ছাড়িয়া চলিলেন। মানুষের ভালর জন্য অজানা দেশের পথ ধরিলেন।

চলিলেন আঁধার রাতে, নূতন পথে; মাঠের পর মাঠ পার হইয়া কত দূরে চলিয়া গেলেন। অনেক দূর যাইয়া, এক পাহাড়ের গুহা,—তারই মধ্যে তাঁরা আশ্রয় নিলেন।

এখন সেই যে গুহা, তার গায় গর্ত—গর্ত অনেক।

অচিন খাত—সাপের হাত।

আবু বকর কাপড় ছিঁড়িয়া গর্ত বুজাইলেন।

এক দুই তিন,
গর্তের নাই চিন।—

এদিকে গর্ত যে একটা বাকী।—কাপড় আর কুলায় না। কি করিবেন।—তখন আবু বকর পা দিয়াই সেই গর্ত ঢাকিলেন। পাছে নবীর কোন বিপদ হয়, এই তাঁর ভয়।

গুহার মধ্যে নবীর ঘুম আসিল।

আবু বকর জাগিয়া থাকিলেন।—নবীর মাথা তাঁর কোলে, চোখ তাঁর নবীর মুখে, আর তাঁর পা থাকিল সেই গর্তের গায়। এখন সেই গর্তে ছিল এক সাপ; সেই সাপ পায়ের আঙ্গুলে দংশন করিল। দংশনে অঙ্গ জ্বলে; বিষের জ্বালায় মাথা টলে ; তবু তিনি অটল। তিনি না নড়েন, না চড়েন। পাছে নবীর ঘুম ভাঙ্গে এই তাঁর ভয়।

ব্যথায় তিনি কাঁদেন ; চোখের পানিতে তাঁর গা ভাসে। পানি পড়িল নবীর গায়, নবী জাগিয়া উঠিলেন,—দেখেন, আবু বকর কাঁদিতেছেন। তখন নবী কি করিলেন—মুখের থুথু নিয়ে সেই আঙ্গুলে লাগাইয়া দিলেন। আল্লার হুকুমে সাপের বিষ পানি হইয়া গেল। এত যে জ্বালা-যন্ত্রণা সব ঠাণ্ডা।

থাকেন তাঁরা সেই পাহাড়ের গুহায়—সেই খানে জন নাই, প্রাণী নাই, বাও নাই, বাতাস নাই, শব্দ নাই, গন্ধ নাই ; সেই নিঝুম গুহায় তাঁরা থাকেন।

এদিকে আবার কি হইয়াছে।—যত সব কোরেশ, তারা চারিদিকে নবীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এখানে সেখানে কত কত জায়গায় খুঁজে, কোনখানেই পায় না।

এখন কোরেশদের মধ্যে ছিল একজন লোক, সে মানুষের পায়ের দাগ চিনিত। দাগ ধরিয়া কোন্ মানুষ কোথায় গেল, তা সে বাহির করিত। একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে আবু জেহেল, আবু লাহাব এরাই সব হজরতকে খুঁজিতে চলিল। খুঁজিতে খুঁজিতে সেই যে গুহা, যেখানে নবী আছেন, তারই কাছে তারা উপস্থিত হইল।

ছোরা ছুরি তলোয়ার ধর্ ধর্ ধর্ কোথা গেল নূরনবী খুঁজে বের কর্।

এদিকে সেই গুহায় তাঁরা একা—নবী আর আবু বকর দুইটি প্রাণী,—সহায় নাই, সম্বল নাই। দুশ্‌মন ধরিতে আসিতেছে। তাদের কথা শুনা যাইতেছে। কি হইবে ! কে বাঁচাইবে !—

আবু বকরের মনে ভয়,
কি যেন এখন হয়।
দুশমন শত আসে রণে,
আমরা কেবল দুইজনে।

তিনি সেই কথা নবীকে বলিলেন, "এই গুহায় আমরা কেবল দুটি প্রাণী।" নবী বলিলেন, "না, দুই নয় তিন, আমরা তিনজন। আর একজন আমাদের সঙ্গে আছেন,—তিনি আল্লা। রাতে দিনে রণে বনে, সকলখানে, সকল ক্ষণে, আল্লা আমাদের সঙ্গে আছেন।"

আল্লা দেখেন, রাখেন,
যে জানে, তার ভয় নাই মনে।

আল্লার নবী—আল্লাই তাঁর বল ; সকল সময় আল্লাই তাঁর মনে ও সনে—তাঁর ভয় নাই। তিনি বলিলেন, আল্লা আমাদিগকে বাঁচাইবেন।

আয় আয় মাকড়সা মন তোর ফরসা—
জাল বুনে দে।
বাকুম কুম কবুতর কোন ডালে তোর ঘর?—
ডিম পেড়ে নে।

আল্লার হুকুমে সব সাফ। কোরেশেরা যাইয়া দেখে, কোথায় নবী,—আর কোথায় কি। গুহার মুখে মাকড়সার জাল।—আর তার পাশে ডিম। কবুতরে ডিম পাড়িয়াছে।—তাতে না মানুষ গিয়াছে না কিছু। কোরেশেরা বেকুব। বেকুব হইয়া সব ফিরিয়া গেল।

থাকিলেন তাঁরা সেই গুহায়। এই ভাবে তিনদিন, তিনরাত যায়। তারপর তাঁরা বাহির হইলেন,—নবী আর আবু বকর। বাহির হইয়া তাঁরা চলিলেন।—মদিনার পথে যান। পথে এক দুশমনের সঙ্গে দেখা।—

ঘোড়া চড়ে দুশমন আসে
দেখে প্রাণ কাঁপে ত্রাসে।

হজরতকে ধরিতে আসিতেছে। আবু বকর কাঁদিয়া উঠিলেন। নবী বলিলেন, "ভয় কি? আল্লা যে আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাই বাঁচাইবেন।"

আল্লার হুকুমে ঘোড়ার পা মাটিতে বসিয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া সেই কোরেশদের বড় ভয় হইল।—ভয় ভয় দারুণ ভয়। ভয়ে তার বুক কাঁপে। সে তখনই নবীর শিষ্য হইল, কাঁদিয়া মাফ চাহিল।

তারপর চলিলেন তাঁরা সেখান হইতে মদীনার পথে। যাইতে যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। মদিনা ধর ধর করিয়াছেন, এমন সময় আবার দুশমনের সঙ্গে দেখা। একজন নয়, দুইজন নয়, সত্তর জন লোক ; —বরিদা তাদের সর্দার। লোক নিয়ে লশকর নিয়ে নবীকে ধরিতে আসিল। ধর্ ধর্ ধর্ বলিতে দুশমনের দল চারিদিক হইতে নবীকে ঘিরিয়া ফেলিল। দেখিয়া আবু বকর ভয়ে কাঁপেন। নবীর জন্য তাঁর বুক ফাটে; হায় এইবার বুঝি তাঁকে ধরিয়া নেয়।

চারিদিকে দুশমন খাড়া—
তলোয়ারের বেড়া।

কিন্তু কে কাকে ধরে?

ধরতে আসে যে,
ধরা দেয় সে।

আস্‌লে পরে আশা পোরে, শান্তি মধু বয়।
আস্‌ল যেরে চিনি তারে, আপন সে যে হয়।
কি গুণ ছিল নবীর মুখে, কি মধু তাঁর চোখে,—
ধরতে এসে দুশমনেতে মাথায় করে রাখে।

নবী বলিলেন, "ভাই বরিদা তুমি আসিলে ; তোমার আসাতে আমাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আমাদের শান্তি। তুমি ত ইস্‌লামেরই অংশ, আমাদের আপন।"

বরিদাকে নবী এই কথা বলিলেন। বলিলেন ত বলিলেন, এমন মধুর স্বরে বলিলেন যে, তা শুনিয়া বরিদা একেবারে পানি হইয়া গেল। কোথায় গেল তার রাগ, আর কোথায় গেল তার হিংসা।—এমন মানুষ !—এমন মধুর !—এমন ত আর দেখি নাই। জানের যে দুশমন সেই হইল তাঁর আপন !

বরিদা তখন নবীর শিষ্য হইল, আর শিষ্য হইল তার সঙ্গের সেই সত্তর জন লোক।

আল্লার বলে সকল বিপদ দূর হইল। আঁধারে আলো জ্বলিল। পাষাণে পানি বহিল। শত্রু মিত্র হইল।

তখন শিষ্য নিয়ে, সঙ্গী নিয়ে, লোক নিয়ে, লশ্‌কর নিয়ে, মাথার উপরে নিশান উড়িয়ে আল্লার নবী মদিনায় প্রবেশ করিলেন।

সত্যের বল

ঘুম ঘুম ঘুম, নিঝুম ঘুমের পুরী, ঘুমপুরীতে রাজপুত্র। গেলেন রাজার ছেলে ঘুমের পুরে, আর সবাই জাগিয়া উঠিল।—গাছে পাখী ডাকিল, বাগানে ফুল ফুটিল, আঁধারে হাসি খেলিল।—রাজপুত্র সোনার পালঙ্কে পা মেলিলেন।

নবী গেলেন মদিনায় ; মদিনায়, মানুষ জাগিল। দলে দলে লোক ছুটিল ; লোকে বলিল,

নবী এলেন ঘরে,
নেরে মাথায় করে।
ওরে খোল্ খোল্—ঘর খোল্, দুয়ার খোল্,
সকল দুয়ার খুলে দে,
নূরনবী বরে নে।

লোকে সকল দুয়ার খুলিয়া নবীর বরণ করিল—

আসুন নবী আমার ঘরে !
কিন্তু নবী নন রাজার ছেলে,
ঘর তাঁর গাছের মূলে।

তিনি ঘর দিয়া কি করিবেন ?

খেজুর গাছের পাতা, তাই দিয়ে তাঁর মস্‌জিদ, সেই মস্‌জিদে তাঁর ঘর।—আর খেজুর পাতার পাটি, তাই তাঁর বিছানা। তিনি ত সুখ করিতে আসেন নাই,—তিনি নূরের নবী, দুঃখের ভাগী, দুঃখীর তিনি ভাই। তিনি চান মানুষের মঙ্গল। মদিনায় থাকেন, মানুষের জন্য কাঁদেন, আর ধর্মের কথা বলেন। লোক দলে দলে মুসলমান হয়।

মদিনায় মানুষ জাগল, ধর্মে তাঁদের মন মজিল। মক্কার মোসলেম, নবীর যাঁরা সঙ্গী তাঁদের কষ্টের সীমা নাই; তাঁদের বড় বিপদ।—তাঁদের না আছে ঘর, না আছে দুয়ার, তাঁরা কোথায়ই বা যান, আর কিই-বা খান, তবুও তারা সুখী।

হাসিতে তাঁদের মুখ
বলে তাঁদের বুক ভরা।
ধর্মই তাঁদের সুখ।

দেখিয়া মদিনার মানুষ একেবারে মজিয়া গেল। মদিনার মানুষ বলিল, "মক্কার মোসলেম আমাদের ভাই, মুসলমান আমাদের ভাই।"

ভা'য়ের ঘরে ভা'য়ের ঘর,
ভাইরে কিসে ক'রব পর ?

তাঁরা মক্কার মুসলমানদের ভাগ করিয়া দিলেন—নিজেদের ঘর দুয়ার ; সুখ আর সম্পত্তি।

মুসলমান সব সমান ;—তারা সব ভাই ভাই।

এমনি করিয়া দিনে দিনে সত্যের বল বাড়ে ; দিনে দিনে ধর্মের আলো জ্বলে।

তখন কোরেশদের হইল ভয়ানক রাগ ; নূরনবীর জয় হইল, মুসলমানের বল বাড়িল; না, না—কিছুতেই না, নূরনবীকে মারিতেই হইবে। মক্কার কোরেশ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ জুড়িয়া দিল। তারা গায়ের জোরে সত্যকে মারিয়া ফেলিবে।

তীর তলোয়ারে লড়াই চলিল। কত কাটাকাটি হানাহানি। নবীকে মারিবার জন্য কোরেশেরা যে কতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তা আর বলিবার নয়। তারা কত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিল। কোরেশের সঙ্গে ইহুদিরা মিলিল। ইহুদি সঙ্গে খ্রীস্টান মিলিল—আল্লার আলো নিবাইয়া দিবে,—মুসলমানদের মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু কিছুই হইল না। কাফেরের দল হার মানিল।

সত্যের বল মহাবল
তীর তলোয়ার সকল তল।
মুসলমানের আল্লার আলো চোখে,
সত্যের বল বুকে।
সকল ঠেলিয়া মুসলমানের বল বাড়িল।

কাফেরের দল কতবার হারিয়া গেল; আবার আসিল; আবার লড়িল, লড়িল হটিল; হটিল লড়িল।

কত তীর ছুঁড়িল। পাথর মারিল। পাথরে নবীর দাঁত ভাঙ্গিল, রক্তে নবীর মুখ ভাসিল, নবীর কত বীর শহীদ হইল।

নবী বলিলেন, "আল্লা। এদের ক্ষমা কর ; এরা কি করিতেছে জানে না, এদের হিতাহিত জ্ঞান নাই।"

আল্লার নবী অটল,
ধর্মের বল অজেয়।
কিছুতেই তাঁর ভয় নাই।

এক লড়ায়ের মাঠ, মাঠের মাঝে গাছ ; গাছের তলে নবী,—শুয়ে নবী একা; নিঝুম তাঁর ঘুম। তীর নাই, তলোয়ার নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই। দেখিয়া একজন লোক ছুটিয়া আসিল দসুর তার নাম ; দস্যুর মতই সে কাটিতে আসিল—নবীকে কাটিতে তলোয়ার তুলিল। নূরনবী জাগিয়া উঠিলেন। দসুর হাঁকিয়া বলিল, "এখন তোমাকে বাঁচায় কে?" আল্লার নবী আল্লাই তাঁর বল। তিনি বলিলেন, "আল্লা।" ভীম রবে বলিলেন "আল্লা", বুকে তাঁর আল্লা ; মুখে তাঁর "আল্লা।" তাঁর চোখের কি তেজ ! মুখের কি জ্যোতি ! ভয়ে কাফেরের বুক শুকাইল ; তার শরীর কাঁপে থর্ থর্। তার হাতের অসি পড়্ পড়্—হাতের তলোয়ার খসিয়া পড়িল। নবী সেই তলোয়ার তুলিয়া নিলেন, বলিলেন, "কাফের, এবার তোকে বাঁচায় কে?" কাফের সেত আল্লা জানে না—সে বলিল, "তুমি, নবী তুমি আমায় বাঁচাও।" সে ভাবিল, নবী তাকে মারিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আল্লার নবী—নূরের ছবি, প্রেমের ফুল, মানুষের দুঃখে আকুল। তিনি বলিলেন, "হায়। হায়। এখনি ত দেখিতে পাইলে, বাঁচায় কে?—বাঁচায় আল্লা। আল্লাই যে আমাকে বাঁচাইলেন।" এই বলিয়া নবী তাকে ছাড়িয়া দিলেন ; কাঁদিয়া সে নবীর উম্মত হইল।

এইরূপে সত্যের জয় হইল। নবীর পূণ্য আর প্রেমের বলে, কাফেরের দল একেবারে হারিয়া গেল। কোরেশের বড় বড় সর্দার মুসলমান হইয়া গেল। দশ বৎসর পরে নূরনবী মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন।—তখন দেশের তিনি রাজা।

প্রেমের জয়

কোন দেশে সে রাজার ছেলে
　　গিছ্‌ল গহন বনে ;
হস্তি চড়ে এল ফিরে,
　　বসল সিংহাসনে।
আঁধার পুরে হাসল ওরে
　　সোনার শতদল ;
মাথার পর উজল করে
　　মানিক ঝলমল।

নবী আসিলেন মক্কায়।—কোথায় তাঁর গজমতি হাতী? কোথায় তাঁর মানিক উজল সিংহাসন? সত্য তাঁর সোনা-দানা,—প্রেম তাঁর মানিকফুল? মানুষের মন,—তাই তাঁর সিংহাসন। আসিলেন নবী মক্কায়,—কত সাধের জন্মভূমি। সেখানে কতকাল পরে ফিরিয়া আসিলেন,—দেশে ফিরিলেন। আজ মক্কার ঘর দুয়ার খোলা। মক্কার তিনি রাজা। মক্কার যত লোক সব তাঁর পায়।

ঝন্ ঝনা ঝন্ তীর বল্লম
　　কোথায় হল দূর।
সবার আগে উঠল জেগে
　　সত্য নবীর নূর।
ছুটল যারা অসি নিয়ে,—
মারল যারা পাথর দিয়ে,
প্রাণের পরে আসল ধেয়ে,
　　কোথায় তাদের বল?
নবীর আগে পরাণ মাগে
　　দুশমনেরই দল।

নবী কি তাদের প্রাণে মারিবেন? এত কষ্ট দিয়াছে তারা, তাদের আবার ক্ষমা! তখনই তাদের দুই টুক্‌রা করিয়া কাটার হুকুম দিলেন—না, না,—এমন হুকুম তিনি দিলেন না। তিনি ত রাজা নন। তিনি ত দেশ জয় করিতে আসেন নাই। তিনি হলেন আল্লার নবী, প্রেমের ছবি, মানুষের মঙ্গল—তাই তাঁর কাজ।

কিসের তাঁর শত্রুতা রে
কেবা তাঁহার পর?
মানুষের দুঃখে যে রে
আঁখি ঝর্ ঝর।

মক্কায় যত লোক,—নবী তাদের কি করিলেন? জানের শত্রু তারা—নবী তাদের মাফ করিলেন। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, মক্কার মানুষ,—এরা সবাই আমার ভাই। এদের কেউ কিছু বলিও না।

শুনিয়া কোরেশেরা ত একেবারে অবাক হইয়া গেল। তারা কত ভয় করিয়াছিল,—না জানি নবী কতই যেন তাদেরকে কষ্ট দিবেন ;—কিন্তু নবী কিছু করিলেন না। অনেক কোরেশ, যাদের মন কিছু ভাল, তারা কাঁদিয়া ফেলিল,—কাঁদিয়া নবীর শিষ্য হইল। আর যাদের মন খারাপ তারা চলিয়া গেল। মক্কার শহর তাদের ঘর দুয়ার সব ছাড়িয়া আশে পাশে পাহাড়, তাতেই তারা

আশ্রয় নিল। নবী তাদের দেশ নিলেন, আর সেই নবীর অধীন হইয়া থাকিবে ; এ তাদের পরাণে কিছুতেই সহিল না। তাদের মনে হইল আরো ভয়ানক রাগ।

যাক তারা পাহাড়ে। এদিকে নবী কি করিলেন তাই দেখা যাক। তাঁকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

চারিদিকে মুসলমানের দল থৈ থৈ। আনন্দে মক্কার শহর রৈ রৈ। আজ মুসলমানের যে কত আনন্দ, তা আর বলিবার নয়। তাদের আর আহ্লাদের সীমা নাই। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত-সাধ আহ্লাদ সেই নবী কই? কোথায় গেলেন তিনি? তাঁকে পাওয়া যায় না। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল।

কোথায় নবীস?

কোথায় তাঁর লোকজন, আর কোথায়-বা তাঁর মণিকাঞ্চন। মক্কার অলি গলি, পথ পাথর, তারি মাঝে নবী ঘুরে বেড়ান পথে পথে। এ পথ ছেড়ে সে পথ। না আছে সঙ্গী,—না আছে বন্ধু। কোথায় দুশমন তা-ও জানা নাই। কে কোথায় ছুরি মারে, কিছুই ঠিক নাই।

কোথায় নবী যান?—কি করেন?—

রাজার ছেলে খেলা করে কনক ফুলের বনে,—
ব্যথার ব্যথী নূরের নবী কিসের ব্যথা মনে?
দেশের শোকে কাহার বুক ব্যথায় গেছে ভরে
পথের ধারে বসে কাহার চোখের পানি ঝরে?
আপনা জনে ছাড়ল কারে?—আপন হ'ল পর।
দুশমনেতে আপন হল, কোন খানে তার ঘর?
পাহাড় পুরে চল্ল কে রে? সঙ্গে চলে কে?—
পাথর ভেঙ্গে পানি করে, মধু বহায় সে।

যান নবী—যান। কিসের ব্যথা,—আপন মনে যান।

পথের ধারে বসিয়া এক বুড়ী। সামনে তার পোঁটলা-পুটলী, বুড়ী বসিয়া কাঁদে,—কাঁদে আর নবীকে গালি দেয়। নবীর উপর যে তার রাগ।—রাগ, রাগ, বিষম রাগ। পায় ত একেবারে খাইয়া ফেলে। নবীর জন্যই ত দেশ-ছাড়া। যত সব পাড়া-পড়শী সব গেল পাহাড়ে। পড়িয়া আছে সেই-ই কেবল একা। ছেলেপেলে নাই যে সঙ্গে লইয়া যাইবে। মহা মুশকিল। বুড়ীর যত রাগ নবীর উপর।—নবীর জন্যই এত কষ্ট। সে কেবল কাঁদে আর নবীকে গালি দেয়। এমন সময় নবী যাইয়া সেখানে উপস্থিত। নূরের নবী—প্রেমের ছবি,—দুঃখীর তিনি ধন। কেই-বা তাঁর পর,—আর কেই-বা তাঁর আপন। সকলেই সমান। তাঁর মধুময় মন বুড়ীর দুঃখে গলিয়া গেল। মুখে তাঁর মধু, চোখে তাঁর পানি, দুশমন সেই বুড়ীর ব্যথায় তিনি আকুল। গেলেন তিনি সেই বুড়ীর কাছে। বলিলেন, "মা তোমার কষ্ট কি? তোমার কোন ভয় নাই। কোথায় তুমি যাবে, তাই আমাকে বল, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। তোমার যা কিছু জিনিসপত্র সব আমাকে দাও আমি ব'য়ে নেই। কোথায় তোমার লোকজন, বল, সেইখানে যাই।"

বুড়ী ত মহা খুশী। এমন সুবিধা কি আর ছাড়া যায়? সে তখনি পাহাড়ে চলিল। পিছনে চলিলেন নবী,—বুড়ীর বোঝা তাঁর পিঠে। মনে তাঁর মধু—মুখে তাঁর হাসি। বুড়ী ত আর চিনে না—তিনি কে?

সে আগে আগে যায়, আর নবীকে গালি দেয়। নবী তাকে ভরসা দেন। যান তাঁরা। ক্রমে সেই যে পাহাড়—যেখানে সব কোরেশ,—সেইখানে তারা গেলেন। নবীর আগে বুড়ী আর বুড়ীর যে বোঝা তাই তাঁর পিঠে। বড় শত্রু যারা, তাদেরই মাঝে গিয়া নবী খাড়া হইলেন।

অস্ত্র নাই, বল নাই, বন্ধু বলিতে সঙ্গী নাই, গেলেন তিনি একা,—সেই কোরেশদের মাঝে। কোরেশেরা ত একেবারে অবাক। এ ওর মুখের দিকে চায়। মুখে কারও কথা নাই, একি কাণ্ড! তারা ভাবিল, হায়রে হায় আমরা তো বড় অন্ধ।— আমরা এই নবীকে মারিতে চাই,—কত গালাগালি দেই। আর তিনি কিনা আসিলেন আমাদেরই লোক নিয়ে, 'বুড়ীর পুটলী পিঠে করে'—ইনি মানুষ না দেবতা।

সমস্ত দেশ তাঁর পায়,—হুকুমে তাঁর দুনিয়া কাঁপে—আর তিনিই আসিলেন বোঝা নিয়ে।—দুশমনের উপর রাগ নাই, জানের জন্য ভয় নাই, এত বড় মানুষ। সত্যই ত ইনি নবী ; নইলে কি আর এত বড় মন।

এই ভাবিয়া তখনই অনেক কোরেশ মুসলমান হইয়া গেল। নবীর উপর যে তাদের ভক্তি হইল সে আর বলিবার নয়। তারা যেন মাথায় করিয়া নাচে,—এমনি তাদের আনন্দ।

এইরূপে প্রেমের জয় হইল,—স্বর্গের দুয়ার খুলিল। একদিন সে সোনার দিন। ধর্মের বান ডাকিল। সাফা নামে পাহাড়,—সেই পাহাড়ে নবী। নবী আল্লার নামে ডাক দিলেন। সকল কোরেশকে আল্লার কথা বলিলেন। ধর্মের উপদেশ দিলেন।

আজকে প্রেমের বান ডেকেছে—
আয় ছুটে আয় আমার কাছে,
আল্লার আলো উঠলো জ্বলে,
আয় ছুটে আয় আল্লা বলে।

নবীর সত্যবল বুকে, নূরের জ্যোতি চোখে, প্রেমের মধু মুখে।

নবীর ডাকে সকল কোরেশ পাগল হইল। তারা ভাবিল নবীর ব্যথা। তারা ভাবিল নবীর কথা। নবী কত দুঃখ সহিয়াছেন,—কত কষ্টের বোঝা বহিয়াছেন। তিনি ধন চান নাই,—মান চান নাই। তিনি রূপ চান নাই,—রতন চান নাই। তিনি লোভে ভোলেন নাই,—ভয়ে টলেন নাই। তিনি চাহিয়াছেন আল্লা—বলিয়াছেন আল্লা—আল্লার মাঝে সকল কষ্টই সহ্য করিয়াছেন। মানুষের জন্যই তাঁর এই কষ্ট সওয়া, আঁধার রাতে, সাপের হাতে, বন বিভুঁয়ে, দুঃখ-সাগরে-সাঁতার দেওয়া। সেই নবী আজ মধু মুখে ডাক দিয়াছেন,—আনন্দের খবর দিয়াছেন। আর কি থাকা যায়? তিনি পাথর খাইয়াছেন, গাল দেন নাই। জয় করিয়াছেন, যম হন নাই। আর কি থাকা যায়? তিনি গাল খাইয়া কোল দিয়াছেন ;—রাজা হইয়া সেবা করিয়াছেন। আর কি থাকা যায়? নবীর-প্রেমে সকল কোরেশ পাগল হইল,—পাষাণ গলিল—মধু বহিল। ছেলে বুড়ো পাগল হইয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিল।

হাজার যুগের আঁধার ঘোর,
আলোর মেলায় হ'ল ভোর ;

মক্কার মানুষ দলে দলে মুসলমান হইল। মানুষ বলিল আল্লা,—বাতাসে ভাসিল আল্লা, আকাশে উঠিল আল্লা। দেশ জুড়িয়া আল্লার আলো জ্বলিল। মূর্তিপূজা— পাপের রাজা, চোখের পলকে চূর্ণ হইল। হাজার হাজার মানুষ আল্লা চিনিল,—নবী মানিল। তারা পাপ ছাড়িয়া পুণ্য ধরিল। সত্যের হিরণ কিরণে মানুষের মন উজ্জ্বল হইয়া গেল।

নাইক কেহ আল্লা বিনে,
পূজার কেহ নাইক নাই।
আল্লা বিনে আর মানিনে,

আমরা শুধু আল্লা চাই
নূরের নবী—খোদার নবী,—
ধরম রবি প্রেমের ফুল,
দুঃখ স'য়ে, সত্য ক'য়ে—
ভেঙ্গে দিলেন পাপের ভুল।
আল্লা বিনে আর মানিনে
আমরা শুধু আল্লা চাই।
মানুষ যারা সমান তারা,
মানুষ মানুষ সবাই ভাই।

ব্যথার ব্যথী

ছোট একটি গাছ,—দিনে দিনে বাড়ে,—বাড়িয়া বড় হয়। তার উপর দিয়া কত ঝড় বয়,—কত বৃষ্টি পড়ে,—কত পাতার পর পাতা ঝরে, আবার পাতার পর পাতা হয়,—ডালের পর ডাল উঠে। তারপর ফুল ফোটে,—তারপর ফল হয়।

গাছে ফল ধরিতে অনেক দিন লাগে।

কাজের বেলায়ও তাই হয়। এক দিনে কাজ হয় না। কাজ করিতে দিন লাগে। দিনের পর দিন যায়,—অনেক কিছু সহিতে হয়।

যে ধর্ম ধরে, ধর্ম ধরিয়া কাজ করে, তার যে বিপদ—কত বিপদ সহিতে হয় তা আর বলিবার নয়। কিন্তু শেষ কালে তার যে কথা,—তাই সত্য হয়,—আর সত্যের জয় হয়।

নূরনবী—আল্লার নবী আল্লার কথা বলিলেন। কত মানুষ হাসিল,—কত জন ঠাট্টা করিল। কত যে তিনি কষ্ট সহিলেন,—আর কত যে ব্যথা পাইলেন। তিনি সহিয়া থাকিলেন। তাঁর যা সত্য তাই তিনি বলিয়া গেলেন।

না লোভে ভুলিলেন—না ভয়ে টলিলেন,—না সুখ পাইলেন,—না কাউকে দুঃখ দিলেন। তিনি দুঃখ সহিয়া সুখ দিলেন,—পাথর খাইয়া প্রেম করিলেন।

প্রেমের ফল ফলিল।

তিনি ছিলেন একা,—একেবারে একটি প্রাণী। একে দুই হইল, দু'য়ে চল্লিশ হইল, চল্লিশে শ' হইল, শ'য়ে দেশ ছাইল, তাঁর কথায় দেশ মাতিল। মক্কা-মদিনা পায় লুটিল। মানুষের মনের যে সিংহাসন,—তার 'পর তিনি রাজা হইলেন।

নবী কি রাজত্ব করিবেন? আল্লা ছাড়িয়া সুখ করিবেন? সুখ, সোহাগ, ধন, দওলত কিছুই তাঁর কাছে বড় নয়—আল্লাই বড়,—সকল সাধের ধন। সেই আল্লাই তিনি ভালবাসেন। আর কিছুই চান না।

কত যে তাঁর শিষ্য,—আর যে তাঁর শক্তি। দেশের পর দেশ, কত দেশে তাঁর ক্ষমতা। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি রাজা,—রাজা কেন—বাদ্শা হইতে পারিতেন,—কত বাদ্শা পায়ে লুটিত। কিন্তু নিজের সুখ—তা তিনি চান নাই। পরের সুখ,—তাই তাঁর কাছে বড়। দুঃখী মানুষ,—এই মানুষের যাতে ভাল হয়,—তাই তাঁর কাজ,—আর তাতেই তাঁর সুখ।

তিনি পাপীর জন্য পাগল,—পাপীর জন্যই কাঁদেন। দুঃখীর তিনি ধন, দুঃখই তিনি মাথায় রাখিলেন।

তাঁর যারা শিষ্য আর সঙ্গী,—তাঁদের কত ধন-দওলত ;—কত সুখ তাঁদের ঘরে। কিন্তু নবীর ঘর,—কিছুই সে ঘরে নাই। বাতি হয় ত কোন দিন জ্বলে, কোন দিন জ্বলে না। কত রাত তাঁর আঁধারে কাটে। তাঁর বড় আদরের মেয়ে ফাতেমা খাতুন।—কত সাধের মেয়ে—কত গুণের; সে মেয়ের না ছিল কোন সাধ,—না ছিল আভরণ। গহনা ত দূরের কথা—অনেক সময় পরার কাপড়—তা-ও তাঁর ভাল মত জুটিত না।

নবীর গায়ে ছেঁড়া কাপড়,—ছেঁড়া কাপড়ে শত সেলাই। তাতেই তাঁর দিন যায়।

নবীর কত উম্মত মোস্‌লেম। মোস্‌লেমদের সিংহের মত বল। কত কাফের যুদ্ধ করে; যুদ্ধে তারা হারিয়া যায়। কত ধন মোস্‌লেমদের হাতে আসে।

ধন দওলত নবীর পায়। সোনাদানা গড়াগড়ি যায়। নবী ফিরিয়া চান না।

আল্লাই তাঁর সকল ধনের বড়।

তিনি কোর্মা-পোলাও খাইতে পারিতেন, কিন্তু পাপীর ব্যথা—তাতেই তিনি পাগল। তিনি ছাতু খাইতেন,—আর কোন দিন-বা খোরমা। কোন দিন খাইতেন—কোন দিন খাইতেন না। কত দিন তাঁর খাওয়া হইত না। কতবার তাঁর সাত সাতটা দিন না খাইয়া কাটিয়া যাইত। পেটে তিনি পাথর বাঁধিতেন তবুও কাতর হন নাই, সুখ চান নাই।

নিজের জন্য ত তিনি কিছুই রাখিতেন না; সবই গরীবকে বিলাইয়া দিতেন। কারও কাছে কিছু চান নাই। আল্লা যেমন রাখেন, তাতেই তিনি সুখী। তিনি সানন্দে কষ্ট সন।

নবী কেন কষ্ট সহিলেন?

দুনিয়ায় কত দুঃখী আছে,—কত অনাথ, কত গরীব। কত বেলা তারা খাইতে পায় না। কত কষ্টে তাদের দিন যায়। তাদের যে ব্যথা—সে ব্যথা তাঁর বুকে বাজে। তিনি ব্যথার ব্যথী,—কেমন করিয়া সুখ করিবেন? তিনি যদি সুখ করিবেন তবে কে দুঃখের ব্যথা বুঝিবে। তিনি দুঃখীর সঙ্গে সমান হইয়া দুঃখ সন। গরীবী, —তাই তাঁর গরীবী।

মানুষের জন্য কি তাঁর ব্যথা ; আর কি তাঁর প্রেম ! একদিনের কথা বলি। কিছুই তাঁর হাতে ছিল না। এক গরীব, সে আসিল তাঁর কাছে ;—আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। তিনি সকল গরীবের গরীব। তিনি তাঁকে কি দিবেন? মসজিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। একখানি মাত্র কাপড়—তাই তাঁর গায়। কাপড় বলিতে আর দ্বিতীয় নাই,—সঙ্গেও নাই,—ঘরেও নাই। সেই একখানা কাপড়,—তাই তাকে দিলেন।

তিনি দুঃখীর ভাই।

আর একদিন এক ইহুদি তাঁর বাড়ীতে আসে। আরও চারি জন ছিল তার সঙ্গে। কথা বলিতে বলিতে রাত হইল। নবীর যে চার সাহাবা—হজরত আবু বকর, আলী, ওসমান আর ওমর,—তাঁরা চার জন কি করিলেন, সঙ্গী চারজনকে লইয়া গেলেন, এক এক জন এক এক জনের বাড়ীতে। পড়িয়া থাকিল সেই ইহুদি। কেউ আর তাকে নিতে চান না। সে ভারী দুষ্ট লোক।

নবী তাকে আপন বাড়ীতে স্থান দিলেন। আদর করিয়া খাওয়াইলেন। যত্ন করিয়া বিছানা করিলেন। বিছানা করিয়া শুইতে দিলেন। রাত্রে তার হইল পেটের অসুখ। ভয়ানক অসুখ। শেষে বিছানাপত্র সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। তার ত ভয়ানক লজ্জা। সে কি আর থাকিতে পারে? রাত থাকিতে চুপে চুপে উঠিয়া পলাইয়া গেল। আর কি কথা বলা যায়,—না মুখ দেখান যায়? এদিকে নবী সকালে উঠিলেন। উঠিয়া দেখিলেন—সেই যে ইহুদি, সে নাই। তার ভারী দামী এক তলোয়ার, তাই সে ফেলিয়া গিয়াছে; আর বিছানাময় মলমূত্র। দেখিয়া নবী কি করিলেন? তিনি না গালাগালি দিলেন,—না রাগ করিলেন। তিনি ত 'রহমতুল্‌লিল আ'লামীন'—জীবের পক্ষে মায়া, মঙ্গল আর মধু। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,— "হায় ! হায় ! আমার যে অতিথি,

রাত্রে তার অসুখ হইয়াছে—পীড়ায় সে কষ্ট পাইয়াছে। আমি তাকে দেখিতে পারি নাই—আমি তার যত্ন করি নাই। আমার অতিথি, সে হয় ত রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—বড়ই অন্যায়।"

তখন তিনি কি করিলেন? সেই মল-মূত্রময় বিছানা,—তাই নিজ হাতে ধুইতে গেলেন। তাঁর শিষ্য সহচর—কত মোস্‌লেম তাঁরা ছুটিয়া আসিলেন। তাঁরা থাকিতে মাথার মানিক—নূরের নবী—তিনি সেই বিছানা ধুইবেন। কিন্তু নূরনবী কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, আমার অতিথি, আমার কাজ। আমার দোষেই এরূপ হইয়াছে। আমিই বিছানা ধুইব। এই বলিয়া তিনি সেই বিছানা ধুইতে লাগিলেন। এমন সময় কি হইল,—সেই যে ইহুদি, সে ফিরিয়া আসিল। তার সেই যে তলোয়ার,—ভারী তার দাম। হীরা দিয়া বাঁধা সে তলোয়ার,—তার লোভ সে ছাড়িতে পারিল না। তলোয়ার নিতে সে ফিরিয়া আসিল। মনে তার কত ভয়। কত লজ্জা। না জানি নবী কি বলিবেন। সে আসিল। আসিয়া দেখে এ কি কাণ্ড!—নবী তার ময়লা ধুইতেছেন।

নবী তাকে দেখিলেন। দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন,—সেই তলোয়ার নিয়ে। নবী কি কাটিতে আসিলেন?—না। নবী বলিলেন, "ভাই বড়ই আমার দোষ। সেবা, যত্ন আমি তোমার করিতে পারি নাই। তাই তোমার এই কষ্ট। আমায় মাফ কর, আর এই লও তোমার তলোয়ার।" ইহুদি ত অবাক! তার চক্ষু স্থির। এই নবী?—ইনি কি মানুষ! সে কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়া সে পায় লুটিল।

নবীর মনে ব্যথা, ব্যথায় তাঁর বুক ভরা। আল্লার সব মানুষ,—সেই মানুষের দুঃখে তিনি আকুল। তিনি না শত্রু চিনিতেন,—না মিত্র বুঝিতেন। যে মানুষের ব্যথা,—তারি ব্যথায় তিনি কাতর।

সে অনেক আগের কথা। নবীর তখন প্রথম সময়। তিনি মক্কায় আল্লার কথা বলেন, আর সকলে অত্যাচার করে। নবী কি করেন। রোজ সকালে উঠেন, উঠিয়া কা'বায় যান। সেখানে ফজরের নামাজ পড়েন। রোজ এই রকম যায়। নিকটে ছিল এক বুড়ী,—দারুণ তার রাগ,—রাগে তার বুক ফাটিত। নবীর কিসে কষ্ট হয়,—এই ছিল তার চেষ্টা। সে করিত কি, রাত থাকিতে উঠিত। উঠিয়া নবী যে পথ দিয়া যান, সেই পথে এ-ই বড় বড় খেজুর কাঁটা, তাই সারা পথে পুঁতিয়া রাখিত। মনের আশা—নবী যেই বাহির হইবেন, অমনি পায় কাঁটা ফুটিবে, আর সে দেখিয়া সুখ করিবে। নবী ত আগে থেকেই জানেন তাঁর সব শত্রু। তিনি সাবধানে বাহির হন, দেখিয়া শুনিয়া পা ফেলেন আর পথের যত কাঁটা, তা পাছে আবার কারো পায়ে ফুটে, সে জন্য এক এক করে তুলে ফেলেন। রোজই এই রকম হয়। নবী না রাগ করেন,—না গাল দেন। তিনি বলেন—আল্লা, বুড়ীকে ভাল কর।

একদিন হইল কি, নবী নামাজ পড়িতে বাহির হইয়াছেন। সাবধানে পা ফেলেন, আস্তে আস্তে যান, কিন্তু কাঁটা ত দেখা যায় না। তাই ত! রোজ পথে কাঁটা থাকে, সে দিন নাই। দেখিয়া তাঁর ভাবনা হইল। কেন? বুড়ীর ত ভুল হওয়ার কথা নয়! তবে কেন এমন হইল? না জানি তার কি হইয়াছে। বুড়ো মানুষ, আঁধারে হাত পা-ই ভাঙ্গিয়াছে,—নয় ত অসুখ করিয়াছে।

এই ভাবিয়া তিনি মস্‌জিদে গেলেন। যাইয়া নামাজ পড়িলেন। পড়িয়া কি করিলেন? সেই বুড়ীর বাড়ী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন। বুড়ীর কি হইয়াছে তাই দেখিতে গেলেন। দেখেন বুড়ীর জ্বর,—জ্বরে সে কাতর। দেখিয়া মায়া হইল। ব্যথায় তাঁর বুক ভরিল। বুড়ীকে কত সান্ত্বনা দিলেন; হাতে মাথায় হাত বুলাইলেন; কত ভরসা দিলেন। তারপর ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপে নবী রোগী দুঃখীর সেবা করিতেন। যেখানে ব্যথা সেইখানেই তিনি। তা শত্রুই কি, আর মিত্রই কি। তিনি ব্যথার ব্যথী—চিরদিন দুঃখীর বন্ধু ছিলেন।

কাজের গরব

বাদশা বেগম ঝম্ ঝম্ ঝম্—
গল্পে শুনি ভাই।
বাদশা হ'ল ছুতোর মজুর,
এমন শুনি নাই।
কোন বা দেশের রূপকথা সে,
দিন কি হ'ল রাত।—
বাদশা করে টুপি সেলাই,
বেগম রাঁধে ভাত।
চায় না কিছু পরের কাছে,
পরকে করে দান,—
সকল রাজার উপর দিয়ে
বাড়ল তারি মান।

এক ছিল ধনীর ছেলে। সে এক সুখের পায়রা। সে না দিত মাটিতে পা, না করিত কোন কাজ। ভাল ভাল কাপড়-চোপড়, সাজ-পোষাক, তাই সে পরিত,— আর মনে করিত তার মত বড় লোক আর কে?

নিজের হাতে একটা খড় তুলিয়াও সে ভাঙ্গিত না,—এমনি ছিল সে বাবু। সে হইল বড়লোকের ছেলে,—তার কি আর কাজ করা সাজে। কাজ করিলে যে মান যায়।

ধনীর ছেলে সে,—কাজ করিলে তাঁর মান যায়, কিন্তু দেশের যিনি রাজা, কাজ করাতেই তাঁর মান।

এক রাজার কথা বলি। তিনি একদিন বেড়াইতেছিলেন। এক জায়গায় দেখেন কতগুলি সৈন্য। সৈন্যরা কি করে?—তারা একখানা কাঠ তুলিতেছে। ভারী মোটা একখানা কাঠ, তাই তারা টানিয়া তুলিতেছে এক গাড়ীতে। কাঠখানা ছিল বেজায় ভারী। তাতে লোক আবার মোটে পাঁচজন। বেচারাদের যে কষ্ট হইতেছিল, তা আর বলিবার নয়। নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল তাদের সেনাপতি। তিনি খালি হুকুম করিতেছেন, "তোল বেটারা তোল, গায়ে জোর নাই,—কুঁড়ের বাদশা কোথাকার।"

এমন সময় সেই যে রাজা, তিনি সেখানে হাজির। তাঁর না আছে রাজবেশ,—না আছে মাথার মুকুট। সঙ্গে তাঁর দুই তিনজন লোক। গায়ে সাদাসিদা পোষাক।

এখন রাজা আসিলেন সেখানে,—দেখেন সৈন্যরা কাঠ তুলিতেছে,—আর সেই যে সেনাপতি, সে নবাবের মত দাঁড়াইয়া আছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে সেনাপতি, তুমি যে দাঁড়াইয়া আছ? ওদের সঙ্গে টান না কেন? দেখ দেখি, বেচারাদের কি কষ্ট হইতেছে। তুমিও একটু ধর।"

সেনাপতি রাজাকে চিনিত না। সে রাগিয়া বলিল, "হু, তুমি ত আচ্ছা লোক হে। আমি হইলাম সেনাপতি, আমি কি কাঠ তুলিতে পারি? তাতে আমার মান যাইবে না? আমি কি ওদের মত কুলি যে কাজ করিব?"

তখন সেই রাজা, তিনি যাইয়া সেই কাঠ ধরিলেন। বলিলেন, "ঠিক ঠিক, সেনাপতি, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। তুমি হইলে সেনাপতি, কাজ করিলে তোমার মান যায়। কিন্তু দেখ, আমি ওয়াশিংটন, এই দেশের রাজা, কাজ করাতেই আমার মান।"

এই বলিয়া তিনি করিলেন কি, সেই সৈন্যদের সঙ্গে কাঠ টানিতে লাগিলেন।
রাজা হইলেন মজুর।

বাদশা আওরঙ্গজেব—তিনি ছিলেন এই সমস্ত দেশের বাদশা। এই দেশে তাঁর মত অত বড় বাদশা আর কেউ হয় নাই। সমস্ত কাজই তিনি নিজ হাতে করিতেন। করিতেন ত,—আর খাইতেন কি? অগণিত মণি মুক্তা ছিল তাঁর ভাণ্ডারে। তিনি তার এক পয়সাও নিতেন না। তিনি নিজ হাতে টুপি সেলাই করিতেন,—সেই টুপি বেচিয়া যা পাইতেন, তাতেই তাঁর খাওয়া চলিত।
বাদশা ছিলেন দর্জি।
এত বড় বাদশা, কাজ করাতে তাঁর মান যায় নাই।

রুশিয়ার এক বাদশা, তাঁর নাম পিটার। তিনি নিজের হাতে কাজ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁর এত নাম। তার দেশের লোক, তারা জাহাজ তৈরী করিতে জানিত না। পিটার কি করেন,—তিনি অন্য দেশে যান। সেখানে গিয়া ছুতোরদের সঙ্গে কাজ করেন,—কাঠ কাটেন, কাঠ চিরেন, পালিশ করেন। এমনি করিয়া জাহাজ তৈরী শেখেন। রুশদেশে তাঁর যত মান, এমন আর কারুরই না।
বাদশা ছিলেন ছুতোর।
নাসির উদ্দিন এক বাদশা। তিনি নিজ হাতে সব করিতেন,—ঘর ঝাড়ু দিতেন,—টুপি সেলাই করিতেন,—বই লিখিতেন। আর তাঁর বেগম তিনি নিজ হাতে রাঁধিতেন।
বাদশা বেগমের কথা থাক। বাদশার উপরেও যিনি বাদশা ছিলেন, সেই নূরনবী কি করিতেন, তাই দেখা যাক।
মোস্‌লেমের কথা কি জান? সে কারও কাছে সাহায্য চায় না। সে বলে— 'আল্লা, আমি কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।'
আল্লার নবী, তিনিও তাই করিতেন। তিনি কারও সাহায্য চান নাই। সকল কাজই তিনি নিজে করিতেন। অন্যে তাঁর কাজ করিয়া দিবে,—এ তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না।
নবীর এক চাকর ছিল তাঁর নাম আনেস। আনেস কি বলিয়াছেন তাই শুনিবে? তিনি বলিয়াছেন—'আমি ত নবীর কাজ করিতাম; কিন্তু আমি নবীর যত কাজ করিতাম, নবী আমার কাজ করিতেন তার চেয়ে ঢের বেশী।
নবী ছিলেন সবার সেবক।
তোমরা জান নবী ছাগল চরাইতেন ;—সে ছেলে বেলার কথা। এখন তিনি রাজার উপর রাজা। এখনও তিনি তেমনি। তিনি দুধ দুহিতেন, আটা পিষিতেন, ঘর দুয়ার সব নিজ হাতে পরিষ্কার করিতেন। সাদা সিদা কাপড় তাই ছিল তাঁর পোষাক। তা-ও যদি ছিঁড়িত তবে নিজ হাতেই সেলাই করিতেন। নিজের কাপড় চোপড় তা কেন আবার অন্যে সাফ্ করিয়া দিবে? ময়লা হইলে সব তিনি নিজেই ধুইয়া লইতেন, ছিঁড়িয়া গেলে জুতা পর্যন্তও তিনি নিজ হাতে সেলাই করিতেন।
কাজ করাই তাঁর গৌরব।
একদিন নবী বেড়াইতে গিয়াছেন। সঙ্গে তাঁর আরও অনেক লোকজন। যাইতে যাইতে পথে খাওয়ার সময় উপস্থিত। সকলেই এক জায়গায় আসিলেন। তখন রান্নার আয়োজন হইতে লাগিল। কেউ চুল্লি কাটেন, কেউ পানি আনেন, আর কেউ-বা রুটি তৈরী করেন।
নূরনবী—আল্লার নবী,—আল্লার তিনি সখা। তাঁর আর ভাবনা কি? তিনি ত বসিয়া খাইবেন। তিনি ভাবিলেন,—"না, তা-ও কি হয়। অন্যে কষ্ট করিয়া রাঁধিবে, আর আমি বসিয়া খাইব। অন্যে আমাকে খাওয়াইবে।—ভারি লজ্জার কথা।"

তিনি বলিলেন, "না, তা হইবে না। আমিও কাজ করিব।" এই বলিয়া তিনি কি করিলেন, সব চেয়ে যা ছোট আর কঠিন, তাই করিলেন। তিনি কাঠ কাটিয়া আনিলেন।

নবী হইলেন কাঠুরিয়া।
লজ্জা হ'ল চুরি করায়—
ভিক্ষা করায় ভাই।
পরের জোরে বাঁচে যে রে—
তাহার মানে ছাই।
চায় না কিছু কারো কাছে,
নিজেই করে কাজ,
আপন জোরে জীবন ধরে,
সেই ত মহারাজ।'

পরের সাহায্য হজরত ত কখনও লন নাই। তিনি দুঃখীর ভাই। অন্য দশজন যেমন খাটিয়া খায়, তিনিও তেমনি খাটিয়া খাইতেন।

বসিয়া বসিয়া খাওয়া বা পরের জিনিষ খাওয়া তা তিনি মনের সঙ্গেই ঘৃণা করিতেন।

প্রাণ যায় তা-ও স্বীকার,—তবু যাঁরা বড় লোক তাঁরা পরের সাহায্য লন না।

একদিনের কথা।—হজরত অনাহারে ছিলেন। কত তাঁর শিষ্য সঙ্গী,—কত জনে কত খায়। হজরত যদি হুকুম করেন—কত জনে কত রকমের খাবার নিয়ে আসে। কিন্তু তিন তিনটা দিন তিনি না খাইয়া আছেন ; পেটে তাঁর পাথর বাঁধা। খাবার নাই, কি আর করেন? ক্ষুধা ত দমন করা চাই। তাই পেটে পাথর বাঁধিয়াছেন।

তিন দিনের দিনে গেলেন হজরত মেয়ের বাড়ী। বিবি ফাতেমা তাঁর মেয়ে— হজরত আলীর বিবি, গেলেন তাঁর ঘরে—সেখানে কিছু খাবার জিনিস আছে কি না।

বিবি ফাতেমা কি বলিলেন? তিনি বলিলেন, "বাবাজান। দুই দিন না খাইয়া আছি ; ক্ষুধায় ত আর বাঁচি না।"

হজরত কি করিলেন। চোখে তাঁর পানি বহিল। তিনি বলিলেন, "মা, এই দেখ পেটে আমার পাথর,—তিন দিন আমার অনাহার।"

শিয়াল-শকুন যারা তারাই পরের জিনিস খায়; সিংহ যে সে আপন বলেই আহার করে।

হজরত বাহির হইলেন। দেখেন কোনখানে কিছু কাজ পাওয়া যায় কি না। কাজ করিয়া খাওয়ার যোগাড় করিবেন।

দেখেন এক জায়গায় এক ইহুদি কূয়া হইতে পানি তুলিতেছে। হজরত গেলেন তার কাছে। বলিলেন, "ভাই, দাও আমার কাছে, আমি পানি তুলিয়া দেই।" ইহুদী বলিল, "আচ্ছা"। ঠিক হইল—হজরত পানি তুলিবেন—এক এক বালতি পানি,—আর তিনটা করিয়া খোরমা—এই তিনি পাইবেন।

নবী হইলেন মজুর।

দীন দুনিয়ার বাদশা তিনি —সকল মানুষের মাথার মণি মজুর সাজিলেন।

মজুরী তাঁর মাথার মণি
মজুর তাঁহার ভাই।
মুসলমানের মজুর রাজায়
তফাৎ কিছুই নাই।

হজরত পানি তুলিতে লাগিলেন। দুই বালতি তোলা হইয়াছে এমন সময় কি হইল—তিন দিন তাঁর না খাওয়া, হঠাৎ দড়ি হাত হইতে খসিয়া পড়িল, আর বাল্‌তি কুয়ার মধ্যে পড়িয়া গেল।

দেখিয়া ইহুদির ত মহারাগ। সে হজরতকে চিনিত না। সে রাগিয়া করিল কি, হজরতকে মারিল এক চড়।

নূরনবী–আল্লার নবী। আল্লা বলিয়াছেন,—তাঁর জন্যই দুনিয়ার সৃষ্টি। আর তিনি কিনা কাজ করিতে আসিয়া মার খাইলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মান গেল না, কাজের যে কষ্ট তাতেই মান। পাপ করাতেই লজ্জা, আর পরের জোরে যে বাঁচে, সেই সকল মানুষের ছোট। নূরনবী–হুকুমে তাঁর হাজার হাজার তলোয়ার চলে, কত রাজা বাদশা থর্ থর্ করিয়া কাঁপে—তিনি ইহুদিকে না গালি দিলেন, না রাগ দেখাইলেন। তিনি বলিলেন,—"ভাই, আমায় মাফ্ কর। বাল্‌তি আমি তুলিয়া দেই।"

এই বলিয়া তিনি বাল্‌তি তুলিয়া দিলেন।

তোমাকে যদি কেউ চিমটি কাটে ত তুমি তার কি কর? তাকে কিল মা'র—না? নেহাৎ যদি সামনে কিছু না করিতে পার, তবে পিছনে যাইয়া গালাগালি দাও। কিন্তু হজরত কি করিলেন? হজরত বাড়ী গেলেন মেয়েকে ত দিলেন খোরমা। নিজে কি করিলেন? তিনি বলিলেন,—"আল্লাতা'লা ইহুদিকে মাফ্ কর। সে জানে না, অবুঝ—তাকে মাফ্ কর।"

নবী ছিলেন দুঃখী আর পাপীর ভাই।

যে বড় হইবে সে কষ্ট করিবে,
যে সহ্য করিবে সে বড় হইবে।

পরশ পাথর

তোমরা পরশ পাথরের কথা শুনিয়াছ? সে ত পাথর নয়, সে এক মণি। লোহা হ'ক, পাথর হ'ক, কাঠ হ'ক, কয়লা হ'ক,—সেই মণি ছোঁয়াইয়াছ কি আর তা সোনা হইয়া গিয়াছে—একেবারে লাল টক্‌টকে সোনা।

জগতের কত কত রাজা, আর কত কত ফকির যে সেই মণি পাওয়ার জন্য মাথা খুঁড়িয়াছে, তার আর ঠিকানা নাই।

পরশ পাথর, পরশ পাথর—
হাজার রাজার ধন,—
কোথায় থাকে পরশ পাথর?
কেমন সে রতন?
কোন্ সে বনে, মরুভূমে,
কোন্ সে নদীর কূলে,
সাপের মাথায়, বাঘের হাতায়
এমন মানিক জ্বলে?
মানিক মানিক–পরশ মানিক,
মানিক মরুর ফুল;
মরুভূমে মানিক জ্বলে—
নাইক তাহার তুল।

নবী করিম—তিনি ছিলেন সেই মণি। তাঁর অঙ্গে ছিল নূরের ঝলক—তাঁর মনে ছিল পূণ্যের চমক। ধর্মের ছবি,—সবই তাঁর পূণ্য আর পূণ্যময়।

তাঁর শরীরেই কি—আর মনেই কি,—কোনখানে এতটুকু ময়লা কি এতটুকু পাপ–তা তাঁর ছিল না। সূর্যের কথা ভাব দেখি? সূর্য কেমন? খালি আলো আর আলো; তাতে না আছে কিছু কালো, না আছে কিছু আঁধার। তিনিও ছিলেন তেমনি।

তেজে তাঁর—পাপের আঁধার একেবারে দূর হইল।

তিনি ফুলের মত মধুর—
মানুষকে আনন্দ দিতেন।
তিনি চাঁদের মত শীতল—
মানুষকে শান্তি দিতেন।

তাঁর কথাই ছিল সত্য; তাঁর কাজই ছিল ন্যায়। ন্যায় সত্যে—প্রেম পূণ্যে তিনি হইলেন সকল মানুষের মাথার মণি। রাজা বল, বাদশা বল, নবী বল, পয়গম্বর বল, সকল মানুষের বড় তিনি। সকল নবীর বড় নবী–সকল নবীর শেষ নবী। মানুষের যত সকল গুণ হইতে পারে, সবই তাঁতে ভরা।

তিনি সুখ না করিয়া সেবা করিলেন।
তিনি দুঃখ সহিয়া দান করিলেন।
তিনি ধন না চাহিয়া ধর্ম করিলেন।

সকল কাজে আল্লার আলো উজ্জ্বল করিলেন। আল্লাতা'লা আলোর নবীকে বড় করিলেন। তিনি নবীকে বন্ধু বলিলেন। নবী হইলেন আল্লার সখা।

নবী গুণে পূণ্যে বড় হইলেন। বড় হইলেন,—কেমন বড়? সকল সৃষ্টির উপর উঠিলেন। স্বর্গ, মর্ত্য, গগন, পবন, সকল ভুবনের উপরে উঠিলেন। হুর, ফেরেশ্‌তা—নবী, পয়গম্বর সকলে মিলিয়া বন্দনা করিলেন। নূরনবী আল্লার সঙ্গে দেখা করিলেন।

সেই হইল তাঁর মে'আরাজ। যিনি পূণ্যময়—আল্লার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

নবী পূণ্যের পরশ পাথর।

যে তাঁর কাছে আসিল, যে তাঁর কথা শুনিল, সেই সোনার মানুষ হইল। সেই যে আরবের লোক, যারা ছিল জানোয়ার তারা যে এক একজন মানুষ হইল—যেন এক একজন ফেরেশ্‌তা।

মদিনার মুসলমান, তাঁদের কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। তাঁরা ত আগে লুঠপাট করিয়াই খাইতেন, একে অন্যের জিনিস কাড়িয়া লইতেন। মক্কার লোকদের মতই খুনোখুনি করিতেন।—কিন্তু দেখ, যখন তাঁরা মুসলমান হইলেন, তখন তাঁরা কি করিলেন? তাঁরা হইলেন মানুষের ভাই–মক্কার মুসলমানদের তাঁরা নিজেদের ঘর, দুয়ার, ধন পর্যন্ত ভাগ করিয়া দিলেন।

মানুষ হইল মানুষের ভাই।

এক যুদ্ধের কথা বলি। সেই যুদ্ধে মোস্‌লেমদেরই জয় হয়। ভারী এক যুদ্ধ। তাতে অনেক লোক মারা গিয়াছে। অনেক লোক খুন জখম হইয়া পড়িয়া আছে।

যুদ্ধের পর কি হইল, কয়েকজন মুসলমান—তাঁরা যেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে গেলেন। কোথায় কোন মোস্‌লেম বাঁচিয়া আছে, কি জখম হইয়া পড়িয়া আছে, তাই দেখিতে গেলেন।

এক জায়গায় দেখেন, একজন মুসলমান জখম হইয়া পড়িয়া আছেন, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। দেখিয়া তাঁরা দৌড়িয়া গেলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল পানি—সামান্য একটু পানি, একজন খাইলেই ফুরাইয়া যায়। যাইয়া সেই পানি তাঁকে খাইতে দিলেন। পিপাসায় তাঁর প্রাণ যায়—তবুও তিনি পানি খাইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমাকে নয়, ঐ দিকে দেখুন, আর একজন পড়িয়া আছেন, তাঁর কষ্ট বেশী, যান, তাঁকে যাইয়া পানি দিন।"

তাঁরা দৌড়িয়া গেলেন। দেখিলেন, আর ঠিক একজন সেইরূপ জখম; যন্ত্রণায় আর পিপাসায় তাঁরও প্রাণ যায় এইরূপ অবস্থা। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁকেও পানি দিতে গেলে তিনি

ঐ কথাই বলিলেন। তিনি বলিলেন, "না, আমার দরকার নাই ঐ দিকে দেখুন, আর একজন আছেন, তাঁর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ।"

গেলেন তাঁরা দৌড়িয়া। তিনি আবার বলিলেন আর একজনের কথা। গেলেন তাঁরা তাঁর কাছে। এখন এই যে চারজনের জন তাঁর অবস্থাও সেইরূপ,—যন্ত্রণায় তিনি অস্থির, পিপাসায় তাঁর প্রাণ যায় ! কিন্তু পানি তিনি খাইলেন না। পানি খাইয়া আগে নিজের প্রাণ বাঁচাই, কেউই এমন কথা ভাবিলেন না,—নিজের প্রাণ যায়, তবু তাঁরা পরের প্রাণের জন্যই আকুল।

তারপর দেখ কি হইল। এখন এই যে চতুর্থ জন, তিনি বলিলেন, "সর্বনাশ। আপনারা করিয়াছেন কি। যান যান সেই প্রথম জনের কাছে। তাঁকে যাইয়া পানি দিন, আমি ত ভালই আছি, তাঁর কাছে যান।"

তখন সেই কয়েকজন লোক তাঁরা আবার ফিরিয়া আসিলেন সেই প্রথম জনের কাছে। কিন্তু হায় ! তিনি আর বাঁচিয়া নাই, পিপাসায় তাঁর প্রাণ শেষ হইয়াছে।

দৌড়ালেন আবার তাঁরা আর একজনের কাছে—সেখান হইতে আর একজন। এইরূপে তাঁরা এক এক করিয়া চারজনের কাছেই দৌড়িয়া গেলেন। একজনও বাঁচিয়া নাই,—পিপাসায় আর যন্ত্রণায় সব শেষ।

তাঁরা মরিয়া গেলেন। তবুও অন্যের আগে নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাহিলেন না।

আগে যারা একে অন্যের রক্ত খাইত, এখন তারাই পরের জন্য প্রাণ দিল। নবীর গুণে রাক্ষসের মত আরব, তারা প্রেমে ফেরেশ্‌তা হইল।

নবী বলিলেন,—"মানুষ মানুষের ভাই। মানুষ সব সমান।" আর কি হইল মানুষের যুগ যুগের পায়ের শিকল খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

আরবে কত যে কেনা গোলাম ছিল তার আর সংখ্যা নাই। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কিনিয়া রাখিত ; সেই হইত তার গোলাম। সে গোলাম কি যেমন তেমন গোলাম। তাকে মারা যাইত—কাটা যাইত, তাকে খুন করিয়া ফেলিলেও কারো কিছু বলিবার ছিল না।

আরবের এইসব গোলাম,—তারা মুক্তি পাইল। সে যেন রাজপুত্রের মুক্তি। এক মায়া রাক্ষসী,—তার ঘরে বন্দী হইয়াছিল শত শত রাজপুত্র। তারপর এক বাদশার ছেলে—তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বড়,—তিনি আসিয়া তাদের খালাস করিলেন।

এ-ও হইল তাই। গোলামেরা ত মুক্তি পাইল, পাইয়া তারা কি করিল ?—কোন একটি গাছ, তা যদি ঢাকিয়া রাখাতে কি হয়? না তার পাতা হয়, না তা বাড়িতে পারে। তারপর সেই ঢাকনি—তা যদি একবার তুলিয়া লও ত, দেখিবে—গাছ কেমন করিয়া বাড়ে। তার তখন কি তেজ ! আর কি তার সবুজ রং !

আরবের হাজার হাজার গোলাম,—তাদেরও হইল তাই। নূরনবীর আলো পাইয়া তারা বাড়িয়া উঠিল,—মন তাদের বড় হইল। গুণে গোলাম মাথার মণি হইল। একজনের কথা বলি।

এক ছিল গোলাম। সে হাব্‌শি—কালো কুরূপ চেহারা। সেই গোলাম হইল মোস্‌লেম। এখন তার যে মনিব, সে ছিল কাফের—হজরতের মহাশত্রু। সে সেই গোলামকে কি করিল,—তার উপর মহা অত্যাচার জুড়িয়া দিল। সে কি,—দুপুর বেলায় মরুভূমির বালি, আগুনের মত গরম, তারই উপর সেই গোলামকে শোয়াইয়া রাখিত। কেবল কি শুইয়া থাকা ?—সূর্যের দিকে মুখ করিয়া থাকিতে হইত। নীচে সেই গরম বালি, তার উপরে সূর্যের তেজ, গোলামের সর্বাঙ্গ একেবারে পুড়িয়া যাইত।

এ দিকে ত এই অবস্থা। তার উপর আবার কি,—বুকের উপর দিত পাথর চাপা। একেবারে প্রাণে মারিয়া ফেলার মত অবস্থা।

কাফের সেই গোলামকে এত কষ্ট দিত কেন জান ? সে বলিত, "হয় আল্লার কথা ছাড়, আর না ছাড় ত এই তোমার শাস্তি।"

কিন্তু সেই গোলাম কি করিতেন? তিনি কিছুতেই ধর্ম ছাড়িতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্মই সকলের চেয়ে বড়। আর যা তিনি সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তা তিনি মানিবেনই,—তাতে প্রাণ যায় তা-ও স্বীকার।

সেই দারুণ যন্ত্রণা,—তার ভিতরেও তিনি বলিতেন, "আল্লা এক—আল্লা এক।"

নবীর গুণে কি হইল একজন গোলাম, সেই হইল এমন বড়—সেই হইল সত্যের সেবক।

সেই গোলাম মুক্ত হইলেন। গোলামের গৌরব বাড়িল। গোলাম নবীর সঙ্গী হইলেন। গোলাম হইলেন—হজরত বেলাল।

নবীর গুণে কি হইল
হাজার হাজার মানুষ—পায়ে ছিল তাদের বেড়ি—
গোলামীর বেড়ি ভাঙ্গিয়া গেল।
মাথায় ছিল তাদের বোঝা—
দুঃখের বোঝা দূর হইল।
মনে ছিল তাদের আঁধার—
পাপের আঁধার কাটিয়া গেল।

সেই সময়ের কথা—কোরেশদের তখন ভারি অত্যাচার। কতকগুলি মোস্‌লেম, তাঁরা গিয়াছিলেন একদেশে। আবিসিনিয়া নামে এক দেশ—সেইখানে,—সে একেবারে সমুদ্রের পার। কোরেশদের যে রকম অত্যাচার, তাতে মক্কায় থাকা কঠিন। তাঁরা করিয়াছিলেন কি, সেই দেশের যে রাজা, তাঁর কাছে নিয়াছিলেন আশ্রয়।

এদিকে কোরেশেরা কি করিয়াছে, তারা ঠিক পাইয়া সেই রাজার কাছে গিয়াছে—মোস্‌লেমদের ধরিয়া আনিতে। রাজা মোস্‌লেমদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আসিলেন তাঁরা রাজার দরবারে। কোরেশেরা রাজাকে সেজ্‌দা করিল। আর তাঁরা কেবল সালাম করিলেন। রাজা বলিলেন, "কি তোমরা যে আমাকে সেজদা করিলে না? রাজ দরবারের নিয়ম তোমরা জান না নাকি?" মুসলমানেরা বলিলেন, "না, তা নয়, আমরা মোস্‌লেম ; আল্লা ছাড়া আর কাউকেও সেজ্‌দা করি না। এই হইতেছে আমাদের নবীর শিক্ষা।"

তখন রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি তোমাদের সেই নবীর কথা! কি তোমাদের সেই নবীর কথা। কি তোমাদের বলিবার আছে, বল।"

মোসলেমরা বলিলেন নূরনবীর পূণ্যের কথা। বলিলেন—"দেখুন আমরা আগে ছিলাম সে এক পশুর মত—রাক্ষস কি পিশাচ, তার ঠিক নাই। না আমরা কিছু বুঝতাম। সদ্‌গুণের নাম গন্ধও আমাদের ছিল না। আমরা আল্লাতালার কথা জানিতামই না। তা ছাড়া যত রকম পাপের কাজ দুনিয়াতে আছে, তাই আমরা করিতাম। এই ধরুন, মাটির প্রতিমা,—তার না আছে জ্ঞান না আছে কোন শক্তি, তাই পূজা করিতাম;—ভাবিতাম সেই প্রতিমাই দুনিয়ার কর্তা। তারপর মিথ্যা আর চুরি, এই দুইটি ত ছিল আমাদের অঙ্গের অলঙ্কার। দিন রাত কুৎসিত কাজ তাই করিতাম। মরা জীব-জন্তু—আমরা তারই মাংস খাইতাম। নিজের আত্মীয় স্বজন—তার উপর পশু পক্ষীরও মায়া থাকে,—আমাদের তা-ও ছিল না। আত্মীয়ই কি, আর পাড়াপড়সীই কি, দয়া মায়া কারো উপরেই আমাদের ছিল না। লোকের উপর যে জুলুম করিতাম, সে ঠিক রাক্ষসের মত। তারপর আসিলেন আমাদের মধ্যে নবী—আল্লার নবী—হজরত মোহাম্মদ (তাঁর উপর আল্লার শান্তি আর সালাম)। তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিলেন। তাঁর কথায় আমরা রক্ষা পাইলাম। এখন আর পশু নই—যথার্থ মানুষ। এখন আমরা জানি আল্লা এক ; কেবল তাঁকেই মানি, আর কেবল তাঁরই আরাধনা করি। আমরা এখন না কোন কুৎসিত আলাপ করি, না কোন খারাপ কাজ করি। আমরা আত্মীয় স্বজনকে মমতা করি, আর পাড়া পড়শীর সঙ্গে ভাব রাখি।

আমরা দীন দুঃখীকে দান করি। আর যারা অনাথ শিশু তাদের আমরা রক্ষা করি। এই যে আমরা পাপ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, আর মানুষের মত মানুষ হইয়াছি,—এই সমস্তই সেই নবীর গুণে।"

তখন সেই রাজা, তিনি বড়ই খুশী হইলেন, আর কোরেশদের দরবার হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

এইরূপে নবীর গুণে মানুষ-মানুষ হইল। সত্য-পুণ্যের কিরণ পাইয়া মানুষের মন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল।

ফুল ফোটে ফোটে,—পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি—তারপর আর এক পাঁপড়ি এমন করিয়া ফোটে।

যাদের মন ছিল পাথরের মত শক্ত, তাদেরই মন হইল ফুলের মত কোমল,—গুণের গন্ধে আর রসে ভরা।

মানুষের বুক ভরা আঁধার,—যুগ যুগের আঁধার, পাপের আঁধার—কাটিয়া গেল—সত্য ও জ্ঞানের আলো মানুষের মনে জল্ জল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পুতুল-প্রতিমা, গাছ-পাথর যে কিছুই নয়—জ্বেন-ফেরেশতা, পীর-পয়গম্বর কারুরই যে কোন ক্ষমতা নাই,—একমাত্র আল্লাই যে সকলের কর্তা,—এ কথা মানুষ খুব ভাল করিয়াই জানিতে পারিল। মানুষ মানিল আল্লা, মানুষ বলিল আল্লা। মানুষ চাহিল আল্লা, আল্লা। ধন বল, জন বল, রূপ বল, রত্ন বল সকলের উপরে কি চাহিল?—মানুষ চাহিল আল্লা। সোনার ফুল, মতির মালা, হীরার হার, আর মণি মানিক-সব চেয়ে আদরের হইল,—কি হইল? আল্লা।

হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (আল্লা তাঁদের উপর খুশী থাকুন।)—তাঁরা ছিলেন নবীর ছাহাবা, নবীর সঙ্গী ও বন্ধু। একদিন নবী তাঁদের বলিলেন দান করিতে।—আল্লার হুকুম,—সবার উপর তার মান। হজরত ওসমান,—তিনি দিলেন তাঁর সম্পত্তির সিকি ;—সব গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দিলেন। হযরত ওমর দিলেন অর্ধেক আর হজরত আলী,—তিনি দিলেন চারভাগের তিন ভাগ। যে যার মত দীন দুঃখীকে দান করিলেন ; যে যার মত আল্লার হুকুম পালন করিলেন। সকলেই ত দিলেন। আর হযরত আবু বকর,—তিনি কি করিলেন? নবীর বিবি হযরত আয়েশা—তাঁর তিনি বাপ। তিনিও দান করিলেন। কিন্তু তাঁর দান সে আর যে-সে দান নয়। আল্লার হুকুম,—আর কি কথা আছে? হযরত আবু বকর যা কিছু ছিল তাহা সমস্তই আল্লার পথে বিলাইয়া দিলেন—টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড়-সব ! থাকিল একখানি মাত্র কাপড়—শত জায়গায় ছেঁড়া, তাই দিলেন তিনি গায়। তা কি আর গায়ে থাকে? তাতে না আছে বোতাম, না করা যায় তা সেলাই। তখন তিনি কি করিলেন, লম্বা খেজুরের কাঁটা, তাই দিয়া কাপড় গাঁথিয়া নিলেন। আল্লার হুকুম।—হযরত আবু বকর তারই আদর করিলেন,—ধন সম্পত্তি—সুখ, সোহাগ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না।

এইরূপ মানুষ আল্লার আদেশ পালন করিল। মানুষ ভাবিল ধন সম্পত্তি— সেইটাই কি বড়?—না, তা নয়। আল্লার যা ইচ্ছা তাতেই আমি খুশী; সেই আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। তখন আল্লার জীব যে—সেই মানুষের প্রতি মানুষের মন মমতায় ভরিয়া গেল। লোক দীন দুঃখীকে দয়া করিতে শিখিল। সে কি কেবল দয়া?—মানুষ ভাবিল গরীব যে, সে ত আমারই ভাই—ভাইকে কি আর ফেলিয়া রাখা যায়? আত্মীয় স্বজনের ত কথাই নাই। লোকে দীন দুঃখীকে টাকা কড়ির অংশ পর্যন্ত ভাগ করিয়া দিতে লাগিল। নবী বলিলেন, "দেখ, পাড়া পড়শীর মধ্যে যদি কেউ না খাইয়া থাকে, আর তাকে রাখিয়া কেউ খায়, তবে সে মোস্‌লেমই নয়।" শুনিয়া একেবারে দয়ার ধুম পড়িয়া গেল। খাওয়ার সময় আর যে কেউ একা খাইবে, তা আর হওয়ার যো থাকিল না। রাস্তায় রাস্তায় কে দীন দুঃখী আছে তাকে ডাকিয়া আনিবে, তবে দশ ভাই এক সঙ্গে বসিয়া খাইবে। তা আবার কেউ কাউকে ঘৃণা করিবে না—ধনী-মানী, কুলি-মজুর সকলেই এক সঙ্গে বসিয়া খাইবে।

এই হইল মুসলমান ধর্ম,—নবী এই ধর্ম শিক্ষা দিলেন।

তারপর মেয়েলোক,—তাদের কি হইল? তাদের কি আর কষ্ট গেল না? তারা আগে যেমন হাটে বাজারে বিক্রয় হইত তেমনই থাকিল? না, তা নয়। লোকে মা-বোনদের সম্মান করিল। মেয়েলোকের গৌরব বাড়িল। ছেলেও যে, মেয়েও সে,—দুই-ই মানুষ। ছেলেকে দিবে মুক্তা মণি, আর মেয়েকে করিবে খুন। তা কি আর হয়? নবীর গুণে কি হইল,—মেয়েলোকের দুঃখ ঘুচিল। মেয়ে আর কেউ মারিয়া ফেলে না। মেয়েও ছেলের মত ধন সম্পত্তির ভাগ পাইল। মেয়ে মানুষ, পুরুষ মানুষ—সকল মানুষেরই ভাল হইল। চুরি করা, মদ খাওয়া, মিথ্যা বলা—এই সব পাপের কাজ যে লোকে ঘৃণা করিতে লাগিল তা আর বলিবার নয়। যত সব পাপের কাজ তা যেন বর্ষার পানিতে ধুইয়া গেল। থাকিল কেবল পূণ্য আর প্রেম,—প্রেম আর পবিত্রতা।

না কেউ মিথ্যা কথা বলে,—না কেউ কারো অনিষ্ট করে। যা সত্য আর ন্যায়—তাই হইল লোকের কাজ।

নবী বলিলেন,—"তোমরা লেখা পড়া শিখ। সে জন্য যদি দূর দেশে—এমন কি চীন দেশেও যাইতে হয় তা-ও যাও।"

তখন পুণ্যের নদী বহিল—
প্রেমের বান ডাকিল—
জ্ঞানের আলো জ্বলিল

আলো জ্বলিল—জ্বলিল ত জ্বলিল,—ধর্মের জ্যোতি দেশ হইতে দেশে জ্বলিল।

তখন সেই মরুর মাটি মণির মালা হইল। আরব দেশে হাজার মণির মালা দুলিল,—হাজার সোনার মানুষ জাগিল।

কৃষক—সে ক্ষেত্রে লাঙ্গল ধরিল। বণিক—সে বাণিজ্যে চলিল। হাজার যোদ্ধা তীর তলোয়ার, হাতিয়ার বাঁধিল! রাজা, বাদশা সত্যমণির মুকুট পরিল। কবি তখন গান করিলেন, আর পণ্ডিতে জ্ঞানের দুয়ার খুলিলেন,—সাধু স্বর্গের আলো জ্বালিলেন। মানুষের মঙ্গল হইল।

তখন নবীর কাজ ফুরাইল। তেষট্টি বছর বয়স,—তখন তিনি পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

কোথায় গেলেন নূরের নবী—
কোন্ সে স্বরগ পুর?
হাজার ফুলের হাসি ঝরে,
চমকে সেথা নূর।
জ্বলে রবি—সোনার ছবি—
হিরণ কিরণ দান,
মুক্তা-মণি-হীরার গাছে
অযুত পাখির গান।
আলোর নবী চলে গেছেন—
আলোক মালার দেশে!
সেই দেশেতে যাবে যদি
নেচে হেসে হেসে
গুণের খনি, পরশ মণি—
নবীর কথা ধর
সোনা হ'বে, রাজা হ'বে,
রাজার চেয়ে বড়।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র